

ছোটদের

অশোক



मधुवाता ऋतायते

मधुमत् पार्थिवं रजः

য্যগণের ভারতে প্রবেশ



মধুময়ী এই ভারতের মাটি

ছোটদের

অশোক

অতুলানন্দ চক্রবর্তী

ভূমিকা

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
৩৯-ডি, গল্‌ফ ক্লাব রোড,
কলিকাতা—৩৩
হইতে প্রকাশিত

মূল্য দুই টাকা

মডার্ণ আর্ট প্রিন্টার্স
৬, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট,
হইতে মুদ্রিত

4800

লেখকের নিবেদন

ছোটদের অশোক—এই বইখানি Asoka for the Young নামে আমার ইংরাজি বইয়ের অনুবাদ। এই সুযোগে মূলের পরিবর্তন কয়েক জায়গায় করেছি।

ইংরাজি বইয়ে রাষ্ট্রপতি যে বাণী দিয়েছিলেন এবং উপ-রাষ্ট্রপতি যে ভূমিকা লিখেছিলেন, সে-দুটির অনুবাদ এ-বইয়ে দিলাম।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র বিশেষ করে এই বাংলা সংস্করণের জন্য ভূমিকা লিখে এই বইখানির বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ে ও সুধী-সমাজের নিকট পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সুপণ্ডিত শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত আলাপ আলোচনায় এবং সম্পাদক শ্রীনিত্যানন্দ দাসগুপ্ত ও অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্ক শেখর বাগছি বইখানি দেখে দিয়ে সাহায্য করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করেছেন।

সকলের নিকট আমি যথাযথ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

কলিকাতা
১—১২—৫৬

নিঃ অতুলানন্দ চক্রবর্তী

ইংরাজি সংস্করণের

বাণী

শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্তীর 'ছোটদের অশোক' বইয়ের পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ আমি পড়েছি। বিশেষভাবে ছোটদের উপযোগী ইতিহাসের এই বইখানি অভিনবত্বের দাবি রাখে। সাধারণত আমরা যেসব ইতিহাসের বই দেখি তাতে রাজা-রাজরার যুদ্ধ, নাম তারিখ বর্ণনা ইত্যাদি থাকে। তৎকালীন জনসাধারণের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক জীবনের কথা বা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যা আমরা আজ গ্রহণ করতে পারি তার কথা লিপিবদ্ধ করার উপর ততখানি নজর দেওয়া হয় না। এদিক দিয়ে শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্তী নতুন পথ প্রবর্তন করেছেন এবং আমার বিশ্বাস, সরল ও সহজ-বোধ্য ভাষায় তিনি অতীতকে শিক্ষামূলক করেছেন ও সেই শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করেছেন।

প্রধানত সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর অনেক ভাল লেখা মাঝে মাঝে আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে এবং একথা বলতে পেরে আমি আনন্দিত হয়েছি যে তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর আগের লেখা থেকেও এই সাম্প্রতিক লেখাটি আরও ভাল বলে প্রমাণিত হবে।

রাষ্ট্রপতি ভবন
নয়াদিল্লী — রাজেন্দ্র প্রসাদ
৫ই অক্টোবর, ১৯৫৩

ইংরাজি সংস্করণের

ভূমিকা

বর্তমান সভ্যতায় এমন কী আছে, মানুষের অসীম জীবনধারাকে অর্থপূর্ণ ক'রে তোলে? এইটিই আমাদের যুগের বড় প্রশ্ন। আমরা কি বর্তমান সভ্যতার কাঠামোর ভেতর থেকে তেমন আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে পারি? ভারতীয় চিন্তামানসে এই চরম প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আজও যার মূল্য আছে এমন একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য, বিপরীতধর্মী শক্তি, ভাবপ্রবণতা ও আকাঙ্খার নানা দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে পাওয়া কতকগুলি স্থায়ী বিশ্বাস, অর্থনীতিক ও নৈতিক প্রচেষ্টার সামঞ্জস্য—এইসব দিয়ে গড়ে উঠেছে ভারতের সংস্কৃতি। আমাদের ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এগুলিও বিভিন্নতা লাভ করেছে কিন্তু এর একটি বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করবার নয় যে, আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হ'লে কোন সভ্যতাই সৃজনশীল ও প্রাণবন্ত হতে পারে না।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে সময়টা অশোককে কেন্দ্র ক'রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এই বইয়ে সেই সময়কার প্রধান প্রধান ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। আমাদের দেশে অশোককে

জানেন না স্বীকার করতে শিক্ষিত লোকমাত্রই লজ্জাবোধ করবেন কিন্তু খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলে দেখা যাবে যে, অশোক ভারতের একজন মহান সম্রাট ছিলেন, এর বেশি খুব কম লোকেই জানেন। এই বইয়ে অশোকের জীবন ও কর্মের এবং তারই পটভূমিকা হিসাবে বেদ ও বুদ্ধদেবের শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ও অতি সুখপাঠ্য আলোচনা রয়েছে। অশোক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কোন নতুন নীতি প্রবর্তন করেন নি। তিনি বিখ্যাত হয়েছেন ধর্মানুরাগ, দান, মানবতা ও সাধারণ সুবুদ্ধির জন্য, যেগুলি তিনি তাঁর ধার্মিক জীবন যাপনে প্রয়োগ করেছেন। সকল মহান পুরুষের মতো তিনিও যুগের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে যুগ-প্রতিভার প্রকাশ হয়েছিল। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে বিশ্বের অন্তরে পূর্ণ মঙ্গল বিদ্যমান; তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই বিশ্ব 'ধর্মজাত' এবং 'ধর্মভূত'। তিনি আমাদের সকল চিন্তাহীনতা ও অপ্রমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং সকলের অধ্যাত্ম বোধের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। আমরা সকলেই যেন এই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যের অনুগামী হই এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য অন্তরে শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারি।

শ্রীঅতুলানন্দের এই বইয়ে অশোকের গৌরবোজ্জ্বল বিশ্বাস ও প্রতিভার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। সেই বিশ্বাস থেকে

আজকের দিনেও আমাদের শিখবার আছে, কারণ সভ্যতার বর্তমান সমস্যা একমাত্র আধ্যাত্মিক রূপান্তরের নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারাই সমাধান করা সম্ভব। আমি খুবই আশা করি আমাদের হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে লেখা এই বইটি তারা সকলেই পড়বে।

নয়া দিল্লী
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩

এস, রাধাকৃষ্ণণ

ভূমিকা

মানুষ যা ছিল তা আজ নেই। যা আছে তা থাকতে চায় না। অনেক তার দোষ ত্রুটী দুর্বলতা অক্ষমতা। তবু সে নিজের ভেতর দিয়ে আর সমাজের ভেতর দিয়ে নিখুঁত সম্পূর্ণ হবার স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নের পেছনেই তার অক্লান্ত অভিযান। যে আদর্শের স্বপ্ন সে দেখে, কল্পনায় কখনও কখনও তাকে সে মূর্তি দেয়। সে কল্পনায় বাস্তবের ভিত হয়ত আছে। কিন্তু আছে কি নেই বা কতটা আছে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা তার কল্পনার ভেতরে তার আদর্শের পরিচয়। এমনি একটি কল্পনার আদর্শ আমাদের দেশে রামরাজ্যের শ্রীরামের মধ্যে পাই, পাই চীনের সি হোয়াংতির বা বৃটেনের রাজা আর্থারের মধ্যে। এঁদের চরিত্র সবটাই কাল্পনিক নয়, কিছুটা নিশ্চয় সত্যি যা আশ্রয় করে কল্পনা দানা বেঁধেছে।

কিন্তু শুধু কাল্পনিক চরিত্রেই মানুষকে তৃপ্ত থাকতে হয় নি; বিরলতম কোনো আশ্চর্য লগ্নে মানুষের ইতিহাসে কল্পনার আদর্শও মূর্ত হয়ে সত্যকার মানুষ হয়ে দেখা দিয়েছে।

মগধ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর প্রিয়দর্শী অশোক এমনি একজন মানুষ। ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ও সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের আদর্শ সম্বন্ধ আমরা গড়ে তুলতে চাই। সুদূর অতীতের এক

শতাব্দী একটি মানুষের ভেতর দিয়ে আমাদের সেই চরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার সফল স্বপ্নের ছবি যেন আগে থাকতে আমাদের সামনে নমুনা স্বরূপ তুলে ধরেছে। যা হ'তে পারে, যা হবে তারই আদল সে ছবিতে আঁকা।

ভবিষ্যতের আদর্শ ভারতবর্ষ গড়তে অতীতের আদর্শকে আমাদের জানা দরকার। সম্রাট অশোক সেই আদর্শের প্রতীক। ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের পথ কোনো দিকে রুদ্ধ না করে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সার্থক করে তোলবার যে পথ আধুনিক যুগে বিশ্বময় আমরা খুঁজছি, দু' হাজার দুশো বছর আগের প্রায়ান্ধকার পৃথিবীতে অশোক শুধু তার কাল্পনিক নির্দেশ দেন নি, সেই পথ যথার্থ তৈরী করে দেখিয়ে রাষ্ট্রের বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন।

অশোককে ঠিকমত বুঝতে হলে, যে প্রাচীন ভারতের ভাবধারা অশোকের মধ্যে মূর্ত হয়েছে তাও যথাযথভাবে জানা দরকার। শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্তী সেই দুরূহ কাজটি এ বই-এ এমন সরল সহজ মনোহর ভঙ্গিতে সমাধা করেছেন যে, যাদের জন্যে এ-বই লেখা সেই ছোটরা শুধু নয়, বড়রাও তাঁকে মুগ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাবেন এই আমার বিশ্বাস।

ভারতবর্ষের অতীত নিয়ে আমরা গৌরব করি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সে গৌরববোধ দুর্বলের দম্ভ ছাড়া আর কিছু নয়। বর্তমানের গ্লানি অতীতের ঐশ্বর্য স্মরণ করে ভুলে থাকার চেষ্টা ই

তার মধ্যে প্রধান। সবচেয়ে দুঃখের কথা, অতীতের যথার্থ সম্পদ সম্বন্ধে সুসংলগ্ন সুস্পষ্ট ধারণাও অনেকের নেই। আগামী কাল দেশের ভার যারা স্কন্ধে নেবে তাদের মন অতীতের উত্তরাধিকার আহরণ করবার জন্যে প্রস্তুত করে তুলতে শ্রীঅতুলানন্দের মত লেখকের একান্ত প্রয়োজন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিজ্ঞপ্তি

আজ নূতন করে স্বাধীন হ'য়ে ভারতবর্ষ তার দুহাজার দুশো বছরের পুরাণো অশোককে স্মরণ করছে। কেন? অশোকের প্রতীক নূতন ভারতের সংবিধানের প্রতীক। এই যোগাযোগের নিশ্চয়ই কোন গভীর অর্থ আছে। কি সে অর্থ, সেইটী নূতন জীবনের ছোট ছোট যাত্রী যারা তাদের মনে জাগিয়ে দেওয়ার জন্যই অশোকের এই ছোট্ট কাহিনী লেখা।

অশোকের কথা বলতে গিয়ে তাঁর আবির্ভাবের আগেকার ভারতবর্ষের কথাও আমি বলেছি, কারণ তাঁর প্রতিভা ভাল বোঝা যাবে না যদি কিছুটা না জানা থাকে, তিনি কোন্ কর্ম ও চিন্তাধারার মধ্যে জন্ম ও পরিণতি লাভ করেছিলেন। অশোকের সময় পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় জীবন প্রবাহের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা আমি খুব সংক্ষেপে অনুসরণ করেছি। উদ্দেশ্য, যাতে প্রাচীন ভারতের যা' কিছু মহৎ তা' বর্তমান ভারতের বালক বালিকাদের মন স্পর্শ করে।

অশোক যে ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাও সেই ভারতের এবং তাঁরও উত্তরাধিকারী। কিন্তু, যেমন আমরা পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হই, ঠিক্ তেমনি অনায়াসে জাতীয়

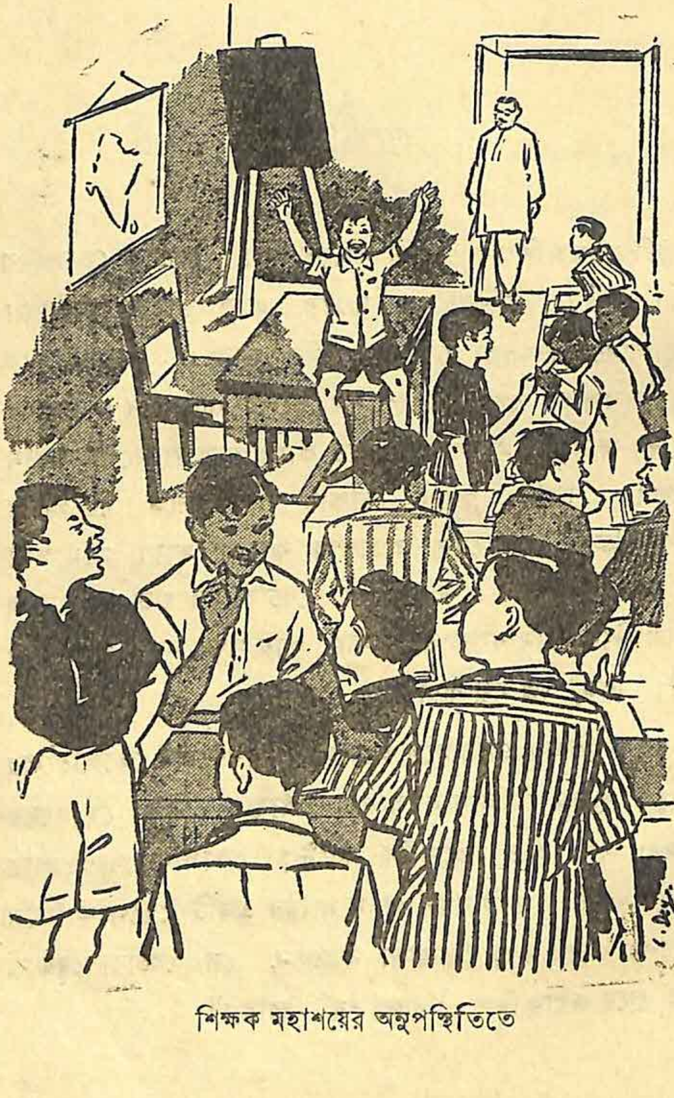
প্রতিভার উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না। তার জন্য চাই অনুভূতি, তাকে জীবনে জীবন্ত করে তুলতে চাই সাধনা। জীবনের পরিকল্পনা তখনই সুগঠিত হয়, যখন অতীতের ধারণা ভবিষ্যতের ধ্যানে মিলিত হয়। তখনই হয় জাতীয় আত্মার চেতনা। এই চেতনা হ'লেই তবে আমরা বর্তমান পৃথিবীর অন্য জাতির উন্নতির অংশ গ্রহণ কর্ত্তে পারি, অন্য জাতিকেও আবার আমাদের নিজের কিছু দিতেও পারি। এই চেতনা নিয়েই তরুণ ভারত এগিয়ে যাবে আমাদের এই নূতন স্বাধীনতাকে সার্থক করার অভিযানে।

অশোক

কথামুখ

ইতিহাসের শিক্ষক সেদিন আসেন নি। ক্লাসের ছেলেদের সে কী স্ফূর্তি। ইতিহাসের ঘণ্টার আজ তারাই মালিক। মনের আনন্দে হৈ-হল্লা সুরু করে দিল তারা। তাদের আর দোষ কি বল? সুযোগ পেলে সব ছেলেই এই করে। আসর বেশ জম-জমাট এমন সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন প্রধান শিক্ষক। তিনি ক্লাসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের আনন্দ-উজ্জ্বল মুখে যেন হতাশার কালো ছায়া নামলো। দেখে দুঃখ হ'ল তাঁর; মায়া হ'ল বেচারীদের জন্য। তাদের আশ্বাস দিয়ে তিনি বললেন, "আজ আর পড়া নয়—পড়া-পড়া খেলা। একটু গল্প-সল্প করা যাক, এস।"

প্রধান শিক্ষক হাসি মুখে অপেক্ষা করে রইলেন কোলাহলের ক্ষীনতম গুঞ্জন মিলিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত। কিন্তু ছেলেদের মন-মরা ভাব অত সহজে কি কাটে? কোথায় খেলা, আর কোথায় পড়া! তাই যখন প্রথম সারির একটি ছেলেকে তিনি সেদিনের পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, সে বেচারা বেজায় বিমর্ষ সুরে জবাব দিল, "রাজা হর্ষ, স্যার!"



শিক্ষক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে

"বেশ, ভাল কথা। তোমরা তো আমাদের দেশের পুরাকালের অনেক রাজার কথাই পড়ে' ফেলেছ দেখছি। তাঁদের মধ্যে কাকে শ্রেষ্ঠ বলে তোমার মনে হয়?" ঠিক্ তাঁর সামনের ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো। তার মুখ দেখে মনে হ'ল দু'তিনটি রাজার নাম নিয়ে সে বেশ একটু মুস্কিলে পড়েছে। কাকে বাদ দিয়ে কার নাম বলবে! শেষ পর্য্যন্ত উত্তর দেবার মুখে প্রধান শিক্ষক কি ভেবে তাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, "আচ্ছা, থাক! মুখে বলতে হবে না। এক টুকরো কাগজের উপর নামটা লিখে ফেল বরং।" তারপর ক্লাশের সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, "সবাই এক এক টুকরো কাগজ নাও। তার এক-পিঠে লেখ তোমার প্রিয় রাজার নাম; আর অন্য-পিঠে তোমার নিজের নাম—যাতে কে কোন্ রাজার নাম লিখলে তা বোঝা যায়। লেখা শেষ হ'লে একে-একে এসে চুপ-চাপ আমার টেবিলের উপর কাগজখানা দিয়ে যাবে। এ-যেন ভারতবর্ষের আদর্শ রাজা নির্বাচনে তোমরা সবাই ভোট দিচ্ছ। মনে রেখ একটির বেশী নাম কেউ লিখতে পারবে না। ভোটগুলি গুণে আমি জানিয়ে দেব, তোমাদের অধিকাংশের মতে কে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলে নির্বাচিত হয়েছেন। আশা করি অন্যেরাও তাঁকেই

শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেবে। আর একটি কথা, অন্যের কথা শুনে যেন কেউ নাম লিখো না। নিজে যা ভাল বুঝবে তাই লিখবে। এবার মনে মনে ভেবে নাও সব বড় বড় রাজাদের নাম। বরং পাঁচ মিনিট ভাব—তারপর লেখ।"

ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতাগুলি মনে মনে দ্রুত উল্টে গেল ছেলেরা। প্রত্যেকেই রীতিমত চিন্তা করতে সুরু করলো। মুখ দেখে মনে হ'ল তারা যেন কোন একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বসেছে। কেউ কেউ শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত কিছু স্থির করে উঠতে পারছে না যেন। তবে বেশীর ভাগ ছেলেরই, মনে হ'ল, সুরুতেই মন স্থির হয়ে গেছে। তবু ভুরু কুঁচকে সবাই নিজ নিজ পছন্দের পক্ষে ও বিপক্ষে নানান যুক্তির কথা ভাবছে, সবকিছু যাচাই করে নিচ্ছে মনে মনে। বেশ একটা থমথমে ভাব। কীই না যেন একটা ঘটতে যাচ্ছে!

পাঁচ মিনিট শেষ হতে না হ'তেই এক-এক করে কাগজগুলি টেবিলে এসে জমা হ'তে লাগলো। ক্লাশে চল্লিশটি ছাত্র। কাগজগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেল হর্ষ পেয়েছেন ১ ভোট, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৮, বাদবাকী আর ২৮ টি কাগজে 'পিয়দসি' অশোকের নাম লেখা।

প্রধান শিক্ষক ঘোষণা করলেন, "তা হ'লে তোমাদের মতে

অশোকই হলেন শ্রেষ্ঠ রাজা। আর সত্যিই তাই। আমাদের দেশের ইতিহাসে এত বড় রাজার নাম আর নেই। তোমরা জান সম্রাট অশোকের ব্যবহৃত একটি প্রতীক আজ স্বাধীন ভারতের শক্তি ও বিশ্বাসের প্রতীক হিসাবে নেয়া হয়েছে।" যে ছেলেরা অশোকের পক্ষে ভোট দিয়েছে আর যারা দেয়নি সবাই তারা একথা স্বীকার করলো। তা ছাড়া অধিকাংশের মত বলেই এ-কথা সত্য নয়। এই কথা সত্যি সত্যিই খাঁটি কথা।

কাগজগুলির ভিতর থেকে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে প্রধান শিকক্ষ বললেন, "আমি শুধু নামই লিখতে বলেছিলাম; কোন যুক্তি দেখাতে বলিনি। এই কাগজখানিতে দেখছি যুক্তিরও উল্লেখ রয়েছে। যুক্তি দেয়া অবশ্য ভাল, তবে ঠিক ভোটের জন্য এর কোন দরকার ছিল না। কাগজখানিতে অশোকের নামের পাশে লেখা আছে, 'যে সম্রাটের সাধনা ছিল পৃথিবীকে দুঃখ-মুক্ত করা।' কাগজটির উল্টো পিঠে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন, "এই কাগজখানি প্রতাপের লেখা। প্রতাপ কার নাম?"

প্রতাপ উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলো। প্রধান শিক্ষক বললেন, "অশোকের জীবনের এই গভীর কথাটি তুমি জানলে কেমন করে? এ-কথার সম্পূর্ণ মানে কি তুমি বোঝ?"

ছেলেটি জবাব দিল, "না স্যার, সবটা বুঝি না। এ কথাগুলি আমার মায়ের কাছে শোনা। তিনি বলেছেন, যুদ্ধ যে কী



মা প্রতাপকে বলিতেছেন

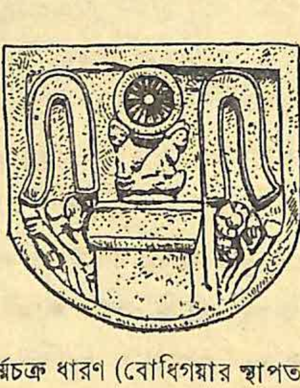
ভয়ঙ্কর জিনিস অশোক তা দেখেছিলেন; আর ভয়ানক দুঃখ পেয়েছিলেন তার ফলাফল দেখে। যুদ্ধের কারণ যা-ই হোক তার ফল সব সময়ই ভয়াবহ। যুদ্ধের ফলে কত মাতা পুত্র-হারা হয়। দেশের সাহসী ছেলেরা প্রাণ হারায়। মানুষের

মনে তখন আর প্রেম-ভালবাসার চিহ্নটুকুও থাকে না। হিংসায় আর হত্যায় মেতে ওঠে তার মন। যুদ্ধ নানান দুঃখ ডেকে আনে পৃথিবীতে। এ আমার মায়ের কথা। তাঁর সব কথার অর্থ আমি বুঝিনি ; কিন্তু এ-সব কথা ভাবতে আমার খুব ভাল লাগে।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন প্রধান শিক্ষক। তারপরে ধীরে ধীরে বললেন, "কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্রাটকে অনুতপ্ত করে তুললো। এই হল তাঁর প্রথম এবং শেষ যুদ্ধ। তিনি স্থির করলেন, যুদ্ধ আর তিনি ঘটতে দেবেন না পৃথিবীতে। তিনি সকলের কাছে আবেদন জানালেন। নিজে তিনি যুদ্ধ জয়ের কথা ভুলে মানুষের হৃদয় জয় করার কাজে আত্মোৎসর্গ করলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন যুদ্ধের পথে যে শান্তি আসে তা শ্মশানের শান্তি। মানুষের জীবন আর সদ্‌গুণ দুই-ই সেখানে বলি দিতে হয়। আর শান্তি যদি বা আসে তো যুদ্ধের ক্ষতি পূর্ণ হতে না হতেই আবার নূতন করে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। শান্তি স্থাপনের জন্য যুদ্ধ করার মত ভুল আর কিছু নেই। তবু এই ভুল পথেই সবাই চলেছে। এমন কি যুদ্ধের পরে যে সন্ধি হয়, শান্তি বলতে আমরা একমাত্র তাই-ই বুঝি। সত্যই যদি আমরা শান্তি চাই, তবে তার

একমাত্র পথ হ'ল সোজা শান্তির পথ—যুদ্ধ দিয়ে নয়, চিরকালের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করে।"

একটু থেমে আবার তিনি বললেন, "অনেক কাল আগের কথা। একজন ধর্ম-প্রাণ রাজপুত্র সিংহাসনের মায়া তুচ্ছ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, মানুষের দুঃখ-মোচনের পথ খুঁজে পাবার জন্য। তাঁর নাম গৌতম। তিনিই বুদ্ধ নামে পরিচিত। পরম জ্ঞান লাভ করেছিলেন বলে তিনি বুদ্ধ। তাঁর জন্মের ২৫০ বৎসর পরে একজন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট জন্মেছিলেন ভারতবর্ষে। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্ত কিছু তিনি নিযুক্ত করেছিলেন বুদ্ধের বাণীকে সফল করে তুলতে। তিনি-ই অশোক। "যুদ্ধ চাই না" এই ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। আমরা যদি যোগ্য ভারতবাসী হ'তে চাই তবে আমাদেরও উচিত মনে প্রাণে এই মহান উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলা।



ধর্ম্মচক্র ধারণ (বোধিগয়ার স্থাপত্য)

বেদের শিক্ষা

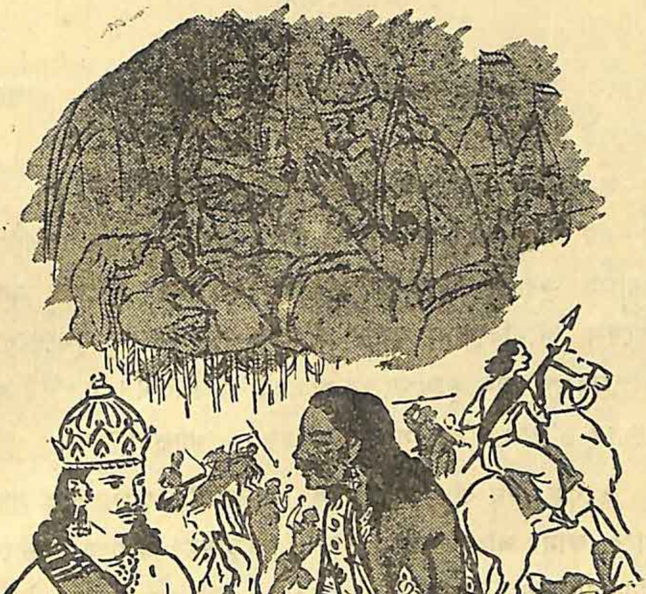
অশোকের কথা আজকাল লোকের বড় বেশী করে মনে পড়ে। চারিদিকে ছড়ানো তাঁর চিহ্ন। আমাদের জাতীয় পতাকার দিকে তাকাও, সেখানে দেখবে অশোক-চক্র। অশোকের সিংহের ছাপ কত কাগজপত্রে যে আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তাঁর সময়কার পৃথিবীতে ভারতের যে প্রভাব ছিল, স্বাধীন ভারতও চায় আজকের পৃথিবীতে তেমনি প্রভাব বিস্তার করতে। চায় সেই প্রভাবকে মৈত্রীর কাজে লাগাতে, যেমনটি তিনি লাগিয়েছিলেন। তাই আজ নুতন ভারতের বারবার মনে পড়ে যায় অশোকের কথা। নূতন ভারতের অন্তর-বস্তু গড়ে তুলতে তাঁকেই আজ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।



যুগ থেকে যুগে এমনি দেয়া-নেয়া চলে আসছে। কে না অতীতের উত্তরাধিকারী? আমরা

যেমন আজ আমাদের জীবনে অশোকের আবির্ভাব অনুভব করছি, তেমনি অশোকও তাঁর আগেকার জাতীয় জীবন থেকে নিজেকে তৈরী করেছিলেন। 'সব মুনিষা মে পজা'—সকল মানুষ আমার প্রজা, আমার সন্তান—অশোকের এই মহান বাণী সে-ও তো বুদ্ধদেবের বাণী—'সকল মানুষ আমার সুহৃদ' এরই প্রতিধ্বনি। তিনি শুধু সেই বাণীটিকে রাজকার্যের যোগ্য করে বলেছেন। তিনি নূতন কিছু করেছেন, এমন দাবী অশোক কখনও করেননি। বরং তিনি বলেছেন, তাঁর যা কিছু নূতন, সে শুধু নূতনের সাজে পুরাতন রীতি—'পোরাণা পকিতি।' তেমনি আবার বুদ্ধদেবের পথও কোন নূতন পথ নয়। তিনি বলতেন, 'আর্য-পথ'।

ভারতের যা মর্মকথা, তার মূল উৎস হ'ল বেদ। অশোকের পিতা এবং পিতামহ বেদের দেবদেবীরই পূজা করতেন। তাঁদের কাছ থেকে অশোক শুধু সিংহাসনই লাভ করেননি, সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিলেন তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস। তাই তো নিজেকে তিনি বলেছেন, "দেবানাম্ পিয়"—দেবতাদের প্রিয়। অথচ দেখ বৌদ্ধরা কোন দেবদেবী মানেন না। দেবদেবী আছে কি নেই, এ বিষয়ে বুদ্ধদেব নিজে কোন কথাই বলেন নি, তিনি শুধু চেয়ে ছিলেন যে মানুষ ভাল হোক। পরস্পরের তারা ভাল করুক। কারণ



অশোক শুনিতেছেন পিতামহ ভীষ্মের শান্তি-বাণীর প্রতিধ্বনি

ঈশ্বরকে সবাই না-ও জানতে পারে, কিন্তু ভাল কাজতো সকলেই করতে পারে।

অশোকের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল কলিঙ্গের যুদ্ধ। তাঁর মন আকুল হয়ে উঠলো শান্তির জন্য। যেমন যুধিষ্ঠিরের হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের কাছে উপদেশ চেয়েছিলেন, আর অশোক শরণ নিলেন বুদ্ধদেবের। কলিঙ্গের যুদ্ধ যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেরই প্রতিধ্বনি। যুধিষ্ঠির আর অশোক দু'জনের জিজ্ঞাসাও যেন এক। আশ্চর্য্য মিল।

তবেই দেখ শুধু অশোককে জানলেই, অশোককে সম্পূর্ণ ভাবে জানা যাবে না। তাঁর পটভূমিকা হিসাবে, অতীতের ভারতবর্ষকেও জানতে হবে। জানতে হবে বৈদিক আর বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস—তাঁর পনেরো-শো বছরের আগেকার ভারতবর্ষকে। কিন্তু তাই বলে সেকালের শিক্ষার সব কিছুই পুরাণো হয়ে যায় নি। তার অনেক কিছুই আজও আমাদের জীবনে নূতন পথের ইঙ্গিত দিতে পারে। যত সংক্ষেপেই বলি না কেন, একদিনে সে-সব কথা বলা সম্ভব নয়। আজ শুধু বেদের কথাই তোমাদের বলবো। আর একদিন বলবো বুদ্ধদেবের কথা। তারপর বলবো পুরাকালের ভারত-বাসীদের এবং তাঁদের রাজ্যশাসন ব্যবস্থার কথা। এই

শাসনধারারই সবচেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছিল অশোকের রাজত্বে।

রাজ্যলাভ করার কয়েক বছর পরে অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বৈদিক ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের কিছুটা পার্থক্য আছে। কেন অশোক বৈদিক ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেন? বৈদিক ধর্ম কাদের ধর্ম? বৈদিক ধর্ম ভারতবর্ষের কি পরিচয় বহন করে ও কত কি মঙ্গল সাধন করেছে? কেনই বা নূতন ধর্মের প্রবর্তন করলেন বুদ্ধদেব? এই সব কথা কিছু না জানা থাকলে অশোকের আবির্ভাবের কারণ আমরা ভাল বুঝতে পারবো না। বিষয়টি খুবই বড় সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু জানা আবশ্যক।

অতীতের সে কাহিনী নানা গল্প-কথার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সমস্ত সভ্যতার সুরুই হ'ল গল্প দিয়ে। এর যে সব গল্প সত্য, তা ই হ'ল ইতিহাসের উপাদান। কিন্তু গল্প যারা বলে, আর যারা শোনে, তারা কেউই গল্পের সত্যমিথ্যা যাচাই করার কথা তখন চিন্তা করেনা। তা-ছাড়া এসব পুরাণো গল্পের সঠিক তাৎপর্য বার করাও শক্ত। নানা জনে নানা রকমের অর্থ করেছেন। বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মত। সে সব তর্কের কচকচির মধ্যে আমি যেতে চাই না। আমি শুধু এ বিষয়ে তোমাদের একটা মোটামুটি বিবরণ দেব, পরে তোমরা

বড় হয়ে পড়াশুনো করে এর সত্যাসত্য বুঝবার চেষ্টা করো।

সন তারিখ, নাম আর ঘটনা, এই নিয়েই হ'ল ইতিহাসের কাঠামো। কিন্তু প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধে এর কোন কিছুই সঠিক করে বলা যাবে না। একটি ছোট্ট উদাহরণ দেই। আমরা যাঁকে রাজা অশোক বলে জানি, তাঁর নাম সত্যি সত্যিই অশোক ছিল কিনা, সে কথাও নিশ্চয় করে বলার উপায় নেই। সে নাম তিনি নিজে একবার মাত্র ব্যবহার করেছেন : দেবানাম পিয়স অশোকস। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন, 'মগধের রাজা পিয়দসি' বলে—'পিয়দসি লাজা মাগধে'। তাও আবার 'পিয়দসি' নাম না উপাধি, তাতেও সন্দেহ আছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অশোকের নাম নিয়েই যেখানে এ সন্দেহ, সেখানে বুদ্ধের পূর্বের ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না। তাই কোন্ কোন্ সময়, কোন্ কোন্ রাজার পরিচালনায় বৈদিক আর্যেরা তাঁদের আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করে ভারতের কোন্ স্থান অধিকার করেছিলেন তা বলা শক্ত। একমাত্র বেদ থেকেই কিছু জানা সম্ভব ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বেদে নিজেদের সম্বন্ধে আর্যেরা কি ভাবে ভারতে এসেছেন তার প্রায় কিছুই

বলেন নি ; এখানে এসে কি ভেবেছেন তার অনেক কিছুই বলেছেন।

বৈদিক আর্যেরা ছিলেন মনে কবি। সাধারণ মানুষের মত কোন ঘটনা যথাযথ লিপিবদ্ধ করা কবিদের স্বভাব নয়। তাঁদের কবি মন সব কিছু নিয়েই গল্প রচনা করেছে। কিন্তু সহজ, সরল লোকেরা যখন নিজেদের সম্বন্ধে গল্প রচনা করে, তখন তার মূলে থাকে তাদের জীবনেরই সত্য ঘটনা। কাহিনীর ভিতরের সেই সত্যকে যদি আমরা আবিষ্কার করতে পারি, তবেই আমরা ইতিহাসের মর্মে গিয়ে পৌঁছতে পারবো। বর্তমানে আর্যদের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি তার সাহায্যে তাঁদের ইতিহাসের ভিতরের খবর প্রায় নির্ভুল ভাবেই দেয়া যেতে পারে ; কিন্তু সন-তারিখ আর ঐতিহাসিক তথ্যের খুঁটিনাটি এখনও পণ্ডিতদের গবেষণা সাপেক্ষ। যেমন ধর, মহাভারতের যুদ্ধ কখন ঘটেছিল তা নিয়ে মতান্তরের শেষ নেই ; কিন্তু একটা বিরাট যুদ্ধ যে ঘটেছিল যার ফলে ভারতবর্ষ বহুকালের জন্য প্রায় বীরশূন্য হয়ে পড়েছিল, এ সম্বন্ধে সবাই একমত।

তেমনি বৈদিক যুগে আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তাধারার পরিচয় আমরা জানি। কিন্তু বেদ কখন এবং কার দ্বারা রচিত

হয়েছিল সে কথা আমাদের অজ্ঞাত। তার কারণ বেদের রচনা কাল বা রচয়িতার কোন স্পষ্ট উল্লেখ বেদে নেই ; কিন্তু বৈদিক কালের চিন্তাধারার স্বাক্ষর আছে তার প্রতি ছত্রে। তাই আমাদের বুদ্ধিমান পূর্বপুরুষেরা বলেছেন যে বেদ ঈশ্বর প্রেরিত, আর্য ঋষিরা তার দ্রষ্টা মাত্র। বেদ মানুষের রচনা নয়, এবং তা যে কখন রচিত হয়েছে তা ঠিক বলা যায় না। মানুষ মানুষকে জানুক। জানুক যে তারা এক, কারণ তারা সবাই মানুষ। এই হ'ল আধুনিক রাষ্ট্র মিলনের মূল কথা। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরাও সকল মানুষকে একসঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন। তাঁরা একথা কখনও বলেননি যে তাঁদের কোন ভুলচুক নেই। নিজেদের অন্যায় কাজের জন্য তাঁরা অনুতপ্ত হয়েছেন, ক্ষমা চেয়েছেন বিনীত ভাবে ঃ

অন্যায় যদি করে থাকি কিছু গ্রামে কিবা প্রান্তরে,
সভাজন মাঝে ব্যথা দিয়ে থাকি যদি কারো অন্তরে ;
হোক সে শূদ্র, হোক সে আর্য, অবিচার কারো প'রে,
করে থাকি যদি, মার্জনা যাচি বিনীত যুক্ত করে।

মানুষে মানুষে এই মিলন শুধু একটা বড় আদর্শের কথা নয়। আজকের দিনে বেঁচে থাকতে হ'লে এর বড় প্রয়োজন। আমরা যদি একে অপরের মত সহ্য করে চলি তা হ'লে কিছুটা মিলন

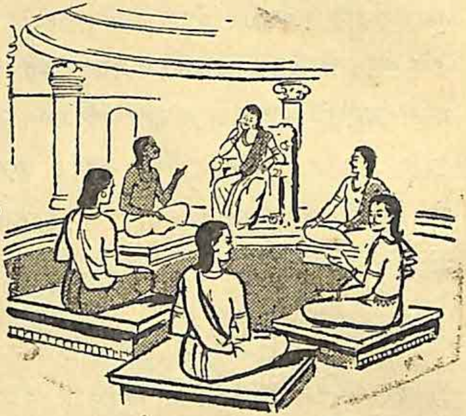
হতে পারে। কিন্তু তা-ও যথেষ্ট নয়। এতে মত বিরোধ দূর হয় না, শুধু চাপা দেওয়া থাকে মাত্র। মানুষে মানুষে বিরোধ দূর করার একটি মাত্র পথ আছে। সে হ'ল মানুষের মনে এই বোধ জাগিয়ে তোলা যে সকলকেই বাঁচতে হবে। হানাহানি যদি চলতেই থাকে তবে কারুরই মরণ-বাঁচনের নিশ্চয়তা নেই। তাই সকলের মঙ্গল চিন্তা করতে হবে সকলকে ; আর জন-কল্যাণকর কাজগুলির মধ্য দিয়েই সকলের মনের মিলন সত্য করে তুলতে হবে।

কিন্তু এই মিলেমিশে বাস করা বড় শক্ত কাজ। দেখতেই পাচ্ছ, বর্তমান পৃথিবীতে সভ্যতার এত উন্নতি সত্বেও এতটুকুও শান্তি নেই। তাই আমাদের পূর্বপুরুষদের সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার এই চেষ্টা যদি বারবার ব্যর্থ হয়েও থাকে তো তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। একতা যে মানুষের কত বড় সম্পদ সে কথাটা যে তাঁদের জানা ছিল, এও বড় কম কথা নয়। তাঁরা জানতেন যে মিলন ততটা সফল হয় যতটা কাজে ও মনে মানুষ এক হ'তে পারে। তাই তাঁরা প্রার্থনা করেছেন :

'সকলের বুদ্ধি এক হোক, মিলন একমুখী হোক, উদ্দেশ্য এক হোক, চিন্তা এক হোক। তোমাদের সকলের জন্য

একই অর্ঘ দিচ্ছি দেবতার পায়ে, একই চিন্তায় তোমরা সবাই মগ্ন হও।'

আর একটি মন্ত্রও তোমাদের শোনাতে লোভ হচ্ছে। এই মন্ত্রটিও অপরূপ :



সভাসদ্ সহ বৈদিক রাজা

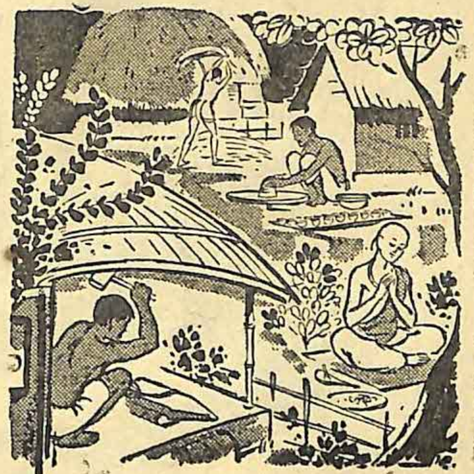
'তোমাদের আমি এক প্রাণ, এক মন, হিংসাদ্বেষ শূন্য করে সৃষ্টি করেছি। গাভী যেমন তার সদ্যোজাত বৎসকে ভালবাসে, তেমনি তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।'—গাভী আর তার সদ্যোজাত বৎসের উপমার কথাটি ভেবে দেখবার মত।

'ঐক্যবদ্ধ সমমনা হও তোমরা। আমার শুভেচ্ছা তোমাদের সকলকে এক করুক। দেবতাদের মত ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবনের অমৃত রক্ষা কর।'

তাঁরা জানতেন যে ভেদ বুদ্ধির মধ্যে একটা মাদকতা আছে। তার আকর্ষণ বড় কম নয়। তাই তাঁরা প্রাণপণে তাকে দমন করতে চেষ্টা করেছেন :

'তোমরা যারা ভেদ সৃষ্টি করতে চাও, তোমাদের আমর মিলনের দিকে বাগিয়ে আনবো।'

তোমরা হয়ত বলবে, কিম্বা একথা তোমরা অনেককেই বলতে শুনেছ যে যারা অনেক দেবতার উপাসক তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য থাকা কেমন করে সম্ভব? তোমাদের এ কথা জেনে রাখা যে দরকার যে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের দৃষ্টি ছিল অখণ্ড। তাঁরা দেবতাদের মধ্যে ভাগাভাগি করেননি; মানুষের মধ্যেও সেই এককেই দেখেছেন। তাঁরা বলেছেন, ভগবান এক, এবং সেই এক পরম পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে সকল মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোন দু-জন লোক দেহে, মনে বা ব্যবহারে এক নয়। মানুষ



একই পরিবারে বিভিন্ন বর্ণের কাজ

হিসাবে অবশ্য তারা সবাই সমান। কিন্তু গুণে তো সকলে সমান নয়। তাই পরমাত্মাকে তাঁরা র্নিগুণ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, 'একম্‌সৎ'-সেই পরম একই সত্য, বহু নামে বলা হলেও তিনি এক-ই।



রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের গায়ত্রী মন্ত্র দর্শণ

বৈদিক যুগে বর্ণ ভেদেরও বিশেষ কোন কড়াকড়ি ছিল না। উপনিষদে দেখা যায় যে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছে আসতেন ব্রহ্ম-বিদ্যা শিখতে। তোমরা

হয়তো ভাববে ব্রাহ্মণেরা চতুর বলে এই ভাবে রাজাদের তোষামোদ করতেন, গাভী, ভূমি আর অর্থ পাবার লোভে। এ-কথা কিন্তু মোটেই সত্য নয়। অনেক যুক্তি দেবার প্রয়োজন নেই; শুধু একটি কথা তোমাদের বলছি। গায়ত্রী মন্ত্রের কথা শুনেছ? এইটি হ'ল বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র। এই মন্ত্রের ঋষি কে জান? বিশ্বামিত্র। কিন্তু বিশ্বামিত্র তো ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় ঋষির এই মন্ত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে ব্রাহ্মণেরা কিন্তু এতটুকুও কুণ্ঠিত হন নি।

এতেও হয়ত তোমাদের সন্দেহ মিটবে না। তোমরা বলবে, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বর্ণ হিসাবে তো খুব বেশী পার্থক্য ছিল না। শূদ্রদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা হ'ত সেইটাই হ'ল আসল কথা। তার বেলায় কী?—এই হয়ত তোমরা প্রশ্ন করবে। এর জবাবেও আমি তোমাদের একটিই দৃষ্টান্ত দেব। তোমরা জান যে বেদের দুই ভাগ, মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ। মন্ত্র কি ভাবে ব্যবহার করা হবে তারই বিধি নির্দেশ আছে ব্রাহ্মণ অংশে। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ দুই-ই মিলে বেদ। তোমরা হয়তো জান যে বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল ঋক্ বেদ; আর ঐ বেদের এক অংশ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, হ'ল ব্রাহ্মণ-গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

গল্প আছে যে এক ঋষির ছিল দুই স্ত্রী। এক স্ত্রী আর্য, অন্য স্ত্রী অনার্য। অনেক ঋষিই এই ধরণের বিবাহ করতেন। সেকালে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়া হ'ত যজ্ঞ স্থলে। একদিন ঋষি যখন যজ্ঞ করছিলেন তখন তাঁর দুই স্ত্রীই তাঁদের পুত্রদের পাঠিয়ে দিলেন ঋষির কাছে শিক্ষা লাভ করতে। ঋষি তাঁর আর্য পত্নীর পুত্রকে সযত্নে শিক্ষা দিলেন, কিন্তু শূদ্রানী পত্নীর সন্তানের দিকে ফিরেও চাইলেন না। পিতার অবহেলায় ছেলেটি মনে ভয়ানক ব্যথা পেল, এবং ফিরে এসে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে সুরু করলো। কেন কাঁদছে জিজ্ঞাসা করায় সে সব কথা খুলে বললো মায়ের কাছে। শুনে তার মা ছেলের শিক্ষার জন্য প্রার্থনা জানালেন মাতা বসুমতীর কাছে। বসুমতী সকল প্রাণীর জননী। তিনি দেখা দিয়ে নিজের হাতে ছেলেটির শিক্ষার ভার নিলেন। ক্রমে মহাজ্ঞানী হয়ে উঠলেন সেই বালক। বিখ্যাত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাঁরই লেখা। এই নামের ভিতর দিয়েই তিনি বিশ্ববাসীকে জানিয়ে গেছেন যে তিনি ইতরা অর্থাৎ নীচ বংশের জননীর সন্তান। এই গল্পটিই প্রমাণ দেবে যে বর্ণের বাধা কখনও যোগ্য ব্যক্তির প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করেনি। তোমরা যখন বল যে আমেরিকায় অতি সাধারণ ঘরের লোকেও রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ

সম্মানের অধিকারী হ'তে পারে, তখন এ কথাই তোমরা স্বীকার করো যে সে দেশের সমাজেও ছোট বড় ভেদ আছে; তবে অসাধারণ মনীষার পক্ষে সে বাধা অতিক্রম করা কিছু শক্ত নয়।



বসুমতী বালকের শিক্ষার ভার নিলেন

বলতে পার যে বৈদিক সভ্যতা এ-সব দিক থেকে না হয় ভালই ছিল; কিন্তু রাজ্য শাসন ব্যাপারে তো সেকাল একালের মত উন্নত ছিল না। সত্যি কথা। কিন্তু একটা জাতি সব দিক থেকে উন্নতির চরম শিখরে গিয়ে উঠবে, এমনটা হয় না। তা'-হলে তো অন্য কারো কিচ্ছু করবারই থাকে না। প্রকৃতি প্রত্যেক যুগ আর প্রত্যেক জাতির জন্য কিছু-না-কিছু হাতে রাখেন। তাঁর সকল উপহার একসঙ্গে উজাড় করে ঢেলে দেন না। মনুষ্য সমাজের বিভিন্ন দল বিভিন্ন

পথে উন্নতি লাভ করে ; কিন্তু তার পরেও অগ্রগতির সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় না। যেমন ধর, বৈদিক যুগের লোকেরাও তাঁদের রাজা নির্বাচন করতেন। কিন্তু তাঁদের নির্বাচন প্রথা ছিল অত্যন্ত সরল। পুরোহিত রাজার নাম প্রস্তাব করতেন, আর সবাই একবাক্যে বলতো, "তাই হোক।" প্রকৃত ক্ষমতাও ছিল জনসাধারণের হাতে। রাজা কোন অন্যায় করলে তাঁরা তাঁকে রাজ্যচ্যুত করতে পারতেন। রাজার কাজ ছিল প্রজাদের মঙ্গল বিধান করা। রাজা যদি ভাল হতেন তবেই তাঁকে প্রজারা মানতো।

আরও আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের পূর্বপুরুষেরা শুধু গণতন্ত্রী ছিলেন না। সমাজতন্ত্রের দিকেও ঝোঁক ছিল তাঁদের। সমাজের সকলের জীবনযাত্রা ছিল একই রকমের। "তোমাদের পানীয় এক হোক; একই খাদ্য তোমরা ভাগ করে খাও; একই কর্মচক্রে তোমরা সবাই যুক্ত. একসঙ্গে মিলিত হয়ে তোমরা অগ্নির উপাসনা কর। চক্রনাভির সঙ্গে চক্রশলাকার মত অচ্ছেদ্য হোক তোমাদের ঐক্য।" অন্যত্র আরও সহজ ভাষায় এই একই কথা বলা হয়েছে। "ক্ষুধার শান্তির জন্য যার যতটুকু খাদ্যের প্রয়োজন সে তা পাবে। কিন্তু প্রয়োজনের বেশী যে নেবে, সে চোর, সমাজের কাছে সে দণ্ডনীয়।'—এই কথাগুলি মনে

হয় যেন কত আধুনিক। এর থেকেই আমাদের প্রাচীন সমাজ-জীবনের রেখা-চিত্র পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগের লোকেরা চিন্তাধারায় কতদূর অগ্রসর ছিলেন, সে-কথা এখন তোমরা নিশ্চয়ই কিছুটা বুঝতে পেরেছো। কিন্তু এতদিন ধরে এতবার তোমরা এর বিপরীত কথা-শুনেছ যে তোমরা হয়তো বলে বসবে: স্বীকার ক'রলাম যে তাঁরা খুবই চিন্তাশীল ছিলেন; কিন্তু তাঁরা অসম্ভব অলস ছিলেন, এ-কথাও তো সত্য? শুধু তোমরা নও, অনেকেই এই ভুল করেন। ছুটি ভারী ভারী ইংরেজী শব্দ প্রায়ই তোমরা শুনতে পাও; কিন্তু তার অর্থ ঠিক বুঝতে পার না। শব্দ ছুটি হ'ল Progressive (প্রগতিশীল) আর Dynamic (কর্ম-চঞ্চল)। পশ্চিমের উন্নত জাতিগুলিকে এই ছুটি শব্দ দিয়ে আমরা অভিনন্দিত করি। তাঁদেয় সম্বন্ধে এই শব্দ-ছুটির প্রয়োগও অবশ্য যথাযথ। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের উপর অবিচার করে বসি। বলি, তাঁরা অলস, কিছু না করতেই ভালবাসতেন তাঁরা। কিন্তু তাঁরাও কর্ম বিমুখ ছিলেন না। সামনে এগিয়ে যাওয়ার মূল্য তাঁদের অজানা ছিলনা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি' মহামন্ত্র, মানুষের এই এগিয়ে চলারই গান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এর অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছেন। এবার শোন কি লেখা আছে তাতে ঃ

রাজপুত্র রোহিত, শোন—ক্লান্ত হয়েও যে পথ চলায় বিরত হয় না তারই লাভ হয় শ্রী, সে-ই পায় জীবনের যা-কিছু কাম্য। সম্মুখে যার গতি,স্বয়ং ইন্দ্র তার পথের সাথী। যে এগিয়ে না যায়, একই স্থানে যে নিশ্চল হয়ে থাকে, তার অন্যগুণ থাকলেও সে বঞ্চিত হয়। অতএব তুমি চল, আগে চল।

চলার পথে যে যাত্রী, তার দেহে পুষ্পের শোভা হয়, তার আত্মা বিকশিত হয়। তার যত কিছু পাপ শ্রান্ত হয়ে পথের পাশে স্খলিত হয়ে পড়ে—আর সে নিজে অশ্রান্ত গতিতে সম্মুখে প্রসারিত পথে অগ্রসর হয়। অতএব তুমিও চল, এগিয়ে চল।

যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে। যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়। যে সম্মুখে অগ্রসর হয়, তার ভাগ্যও অগ্রসর হয়। অতএব তুমি চল, আরও চল।

যে ঘুমিয়ে আছে তার কলি কাল, যে জেগে আছে তার দ্বাপর, যে উঠে দাঁড়িয়েছে তার ত্রেতা, আর সোজা এগিয়ে চলাই সত্য যুগ। অতএব তুমি এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

সামনে এগিয়ে চলাই অমৃতলাভ। গতির মধ্যেই আছে অমৃতের স্বাদ। তাকিয়ে দেখ আলোকের উৎস সূর্যদেবের দিকে। সৃষ্টির আরম্ভ থেকে সুরু হয়েছে তাঁর পথচলা ; মুহূর্তের জন্যও

পথের পাশে তন্দ্রা নামেনি তাঁর চোখে। অতএব তুমিও চল, চল, এগিয়ে চল।



স্থর্য্যদেব ও তাঁর অশ্বগণের অবিরাম গতি
(বোধগয়ার স্থাপত্য)

বুদ্ধের উপদেশ

বৈদিক যুগের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই এখন তোমাদের কিছুটা ধারণা হয়েছে। আশা করি এ-কথাও বুঝতে পেরেছ যে তার মধ্যে নিন্দার বিশেষ কিছু নেই। সে জীবনের মহত্ত্ব যদি তোমার আমার চোখেই ধরা পড়ে, তবে গৌতম বুদ্ধের তো আরও ভাল ভাবে তা জানার কথা। তবে কেন তিনি মানুষকে অন্য এক জীবন পথের সন্ধান দিলেন ? সেই কথাটাই এবার তোমাদের বুঝিয়ে বলি।

বুদ্ধদেব বেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি। কারো বা কোন কিছুর নিন্দা করা ছিল তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি স্বভাবতঃই ছিলেন শান্ত; আর শান্তিই ছিল তাঁর জীবনের কাম্যধন। বেদের যা কিছু ভাল, তা তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কিন্তু অনেককাল ধরে একই পথে চলে চলে বৈদিক উপাসনা কতগুলি জমকালো আর প্রাণহীন অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যখন অনুষ্ঠান বড় হয়ে ওঠে আর মনের বিশ্বাস কমতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে কোথাও কোন গলদ আছে। বুদ্ধদেব দেখলেন ধর্মে আর প্রাণ নেই; কেবল আছে ধরাবাঁধা কতগুলি অনুষ্ঠান। তাই মানুষের জীবনেও নেই শান্তি।



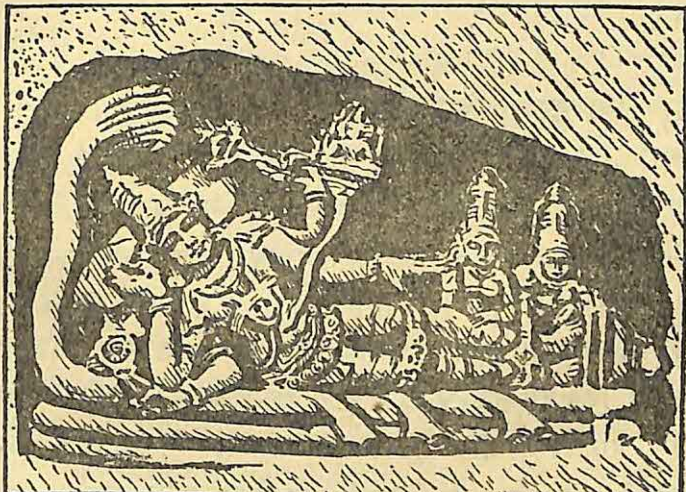
বৈদিক বৃহৎ যজ্ঞ ও পশুবলি

মানুষের তৈরী জীবন-ধারাকে দুটি সাধারণ নিয়ম মানতেই হবে। প্রথমতঃ মানুষের তৈরী বলে তা যত ভালই হোক একেবারে নির্দোষ হ'তে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কালে তার গুণগুলি চাপা প'ড়ে গিয়ে দোষগুলিই বড় হয়ে ওঠে। তারপর সুরু হয় তার পতন। তেমনি বৈদিক যুগের যা কিছু ভাল তা যজ্ঞের জাঁকজমকের ফলে লোপ পেতে বসেছিল।

যজ্ঞ কাকে বলে তা তোমরা একরকম জান। তোমাদের যে-সব ছোট ভাইবোনেরা স্কুলে পড়ে না তারাও জানে। যজ্ঞ বলতে তোমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি ছবি—আগুন জ্বালা হয়েছে, পবিত্র মন্ত্রপাঠ হচ্ছে, আর ঘি ঢালা হচ্ছে আগুনে। কিন্তু এ হ'ল ঘরোয়া যজ্ঞ, যেমন তোমরা দেখেছ বিয়ে, পৈতে কিম্বা পূজাপার্বণের সময়। বৈদিক যজ্ঞে দেবতাদের কাছে অনেক পশু বলি দেয়া হ'ত। রাজারাজরা বেদের ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য বিরাট সব যাগযজ্ঞ করতেন, আর অসংখ্য পশুবলি দিতেন। মূলে কিন্তু বৈদিক যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল পশুবলি নয়, আত্মবলি। বেদেই আছে এর স্পষ্ট ইঙ্গিত। ভগবান স্বয়ং আত্মবলি দিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। এই যজ্ঞের মন্ত্রকে বলা হয় 'পুরুষসূক্ত'।

যজ্ঞের ভিতরের কথা হ'ল এই আত্মবলি। কিন্তু তা শেষপর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেল দেবতার সামনে পশুবলিতে। আত্মত্যাগের মধ্য

দিয়ে দেবতার আশীর্বাদ লাভের কথা মানুষ ভুলে গেল। কথাগুলি একটু শক্ত। এর সম্পূর্ণ মানে তোমরা এখন ঠিক বুঝতে পারবে না। এখন শুধু কথাগুলি মন দিয়ে শুনে রাখ। বড় হ'লে এর অর্থ তোমাদের কাছে পরিষ্কার হবে। অনেক সময় এটা আমাদের করতে হয়। যে কথা জানা দরকার, অথচ শুনেই তা ঠিক বোঝা যায় না, সে-কথা আমরা মনে পুষে রাখি। তারপর তা নিয়ে চিন্তা করতে করতে, এক-সময় তার অর্থ আমরা বুঝতে পারি।



শেষ নাগ-শয্যায় বিষ্ণু (বেলারী স্থাপত্য)

এখন শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে যখনই তুমি কিছু ভালকাজ করছো, তখনই তোমার কিছু ত্যাগ করা হচ্ছে—তা তুমি একটা গাছই লাগাও, একটা রচনাই লেখ, একটি দুঃস্থ লোককে সাহায্যই কর বা দিনরাত পড়ে পরীক্ষার জন্যই তৈরী হও। এই ত্যাগই যজ্ঞ। এ যজ্ঞ তোমরা প্রতিদিনই করছো। বর্তমানের স্ফুর্তি তুমি ত্যাগ করছো, ভবিষ্যতে আরও বড় কিছু পাবার আশায়। এখন কষ্ট করছো ভবিষ্যতে সুখী হবে বলে। এইভাবেই তোমার ত্যাগের মধ্য দিয়ে তুমি শুভবুদ্ধির অর্চনা করছো।

কিন্তু যজ্ঞের এই মূল অর্থের কথা একেবারে হারিয়ে গেল অনুষ্ঠানের আড়ম্বরের মধ্যে। তা দেখে ভাবিত হলেন তপোবন-বাসী উপনিষদের ঋষিরা। তাঁরা ছিলেন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। যজ্ঞের গভীর তাৎপর্যের দিকে লোকের দৃষ্টি ফেরাবার চেষ্টা করলেন তাঁরা। এইখানে বলে রাখা ভাল যে হিন্দুধর্মের মধ্যে থেকেও, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরে, পশুবলির প্রতিবাদ স্বরূপ নূতন বড় দুটি দেবতার পূজা প্রচলিত হয়। এঁরা হলেন শিব আর বিষ্ণু; এঁদের ভোগে আমিষ লাগে না। কিন্তু তখন পশুবলির আড়ম্বরে উপনিষদের কথা চাপা পড়ে গেল। সেই কাজের জন্যই এলেন শাক্য মুনি। বৈদিক বলি-বহুল যাগযজ্ঞের

মন্দের দিকটা তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন সকলকে। তিনি বললেন যে বলিতে সন্তুষ্ট হ'য়ে দেবতারা রাজাদের যুদ্ধে জিতিয়ে দেবেন বা ধনীদের শত্রু বিনাশ করবেন এ-কথা ভাবতে যাওয়া হ'ল দেবতাকেই নীচু করা। এত হ'ল অধর্ম। এর মধ্যে ত্যাগের বিন্দু বিসর্গও নেই। আসলে এ-হ'ল অন্যের ক্ষতি করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা। যে ধর্মে অন্যের দুঃখ বাড়ে, সে ধর্মের মূল্য কী? তা-ছাড়া অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ লাভের এই আকাজ্ক্ষা মনকে কখনও শান্তি দিতে পারে না। অথচ, মনের শান্তিই হ'ল ধর্মের লক্ষ্য। তাই, এ-পথে শান্তি পাওয়া যাবে না। শান্তির পথ ভিন্ন। শান্তি পেতে হ'লে আকাজ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে। তাকেই বুদ্ধ বলেছেন 'নিব্বান'। মানুষ মাত্রেই চায় সুখ, চায় দুঃখের হাত থেকে মুক্তি। কিন্তু যাগযজ্ঞ করে তা হবার নয়। এর জন্য চাই নূতন কিছু। সেই নূতন কিছু হ'ল 'শীল'—সদাচার এবং নীতি-নিষ্ঠা। আকাজ্ক্ষা পূরণের জন্য পশুবলি নয়, আকাজ্ক্ষাকেই বলি দিতে হবে, এই নূতন পথে চলতে হ'লে। নীতিধর্মের আটটি অনুশাসন প্রবর্তন করলেন বুদ্ধদেব। তার মধ্যে প্রধান হ'ল—সত্য চিন্তা, সত্য আকাজ্ক্ষা অর্থাৎ লোকসেবা আর সত্য আচরণ।

বুদ্ধের বক্তব্য হ'ল যে মানুষের আত্মা মুক্ত, তবু মানুষ বাঁধা পড়েছে দুঃখের শৃঙ্খলে। সেকালে রাজনৈতিক মুক্তির কথা

নিয়ে লোকে মাথা ঘামাতেন না। ধন-রত্নের অসমান ভাগ নিয়েও কথা উঠতো না। আসলে এ-সব সমস্যা হয়তো তখন ছিলই না। থাকলেও তা তখন দ্রষ্টব্য আকার ধারণ করেনি। সেকালের ভারতবাসীরা কিছু কম চিন্তাশীল ছিলেন না। এ-সব সমস্যা যদি প্রকট থাকতো তা-হ'লে তাঁরা এ-সব কষ্ট থেকে মানুষের মুক্তির কথাও নিশ্চয়ই বলতেন। প্রাচীন বিশ্বের সামনে তখন মাত্র একটি সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে সমস্যা হ'ল দুঃখের হাত থেকে মুক্তির সমস্যা।

তখনকার দুঃখ-মুক্তির সমস্যা রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতমের মনে কেমন করে জাগলো, সেই গল্পটা এবার শোন।

গৌতম তখনও বুদ্ধত্ব লাভ করেন নি। রাজার ছেলে তিনি। অন্যান্য রাজপুত্রের মতই আমোদ প্রমোদে দিন কাটছিল তাঁর। দুঃখের রূপ যে কী কঠিন তা তিনি চোখেই দেখেন নি। একদিন সিদ্ধার্থ বেড়াতে বেরিয়েছেন, সঙ্গে অনুচর ছন্দক। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো একটি বৃদ্ধের উপর। জরা আর চিন্তার ভারে নুয়ে পড়েছে তার দেহ। দেখে চমকে উঠলেন সিদ্ধার্থ। ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, এর এমন দুরবস্থা কেন? ছন্দক বললো, এই হ'ল জীবনের পরিণতি। বৃদ্ধ হ'লে সকলেরই এই অবস্থা হবে। শুনে বিপদের প্রথম

ছায়াপাত হ'ল গৌতমের আনন্দ-মুখর জীবনে। আর একদিন একটি রোগগ্রস্ত লোককে দেখলেন তিনি পথের পাশে। আবার প্রশ্ন করলেন ছন্দককে। উত্তরে ছন্দক বললো, এই তো জীবন। একদিন না একদিন রোগভোগ সকলের ভাগ্যেই আছে। শুনে সিদ্ধার্থের মনে বিপদের ছায়া আরও ঘনীভূত হ'ল। অন্য একদিন তাঁর চোখে পড়লো একটি মৃতদেহের শ্মশান যাত্রা। যখন শুনলেন যে জীবনের এই শেষ দিন একদিন সবারই আসবে, তখন জীবন অত্যন্ত বিরস হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন, জরা, রোগ আর মৃত্যুর হাত যখন কোনমতেই এড়ানো যাবে না তখন জীবন যাপনের এমন একটা নীতি চাই যা জানলে মানলে ও পালন করলে দুঃখের যাতনা মানুষকে ভোগ না করতে হয়। কেমন করে পাওয়া যাবে সেই শান্তি যা সুখদুঃখের অতীত, যা নির্বিকার। ভেবে ভেবে ব্যাকুল হয়ে উঠলো সিদ্ধার্থের মন। অবশেষে একদিন একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। তিনি বললেন, শান্তির রহস্য যদি জানতে চাও, তবে গৃহত্যাগ করে নির্জনে গিয়ে জ্ঞানলাভের সাধনা কর।

রাজপুত্র নিতে চাইলেন সন্ন্যাস। স্থির করলেন, সংসার পরিত্যাগ করবেন। ঘরে ফেরার পথে শুনলেন, তাঁর একটি পুত্র-সন্তান হয়েছে। সহসা তাঁর মনে হ'ল সংসার তাঁকে আর

একটি কোমল বন্ধনে বাঁধবার ষড়যন্ত্র করছে। আর দেরী নয়, ভাবলেন তিনি। সবাই তখন আনন্দে মাতোয়ারা ; কিন্তু সিদ্ধার্থ নির্বিকার ! ভাবলেন, বেরুতেই যদি হয়, আর দেরী নয়, আজ রাত্রেই। ইচ্ছা হল একটি বার শিশুটিকে কোলে নিয়ে একটু আদর করেন। কিন্তু ভয় পেলেন, যদি স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গে ? তা-হ'লে আর ঘর ছাড়তে পারবেন না তিনি। গভীর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, কিন্তু এত আস্তে যে নিজের কানেও সে শব্দ যেন না যায়। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিলেন ঘুমন্ত স্ত্রী-পুত্রের দিক থেকে। একটি বারও আর পিছন ফিরে তাকালেন না। দ্রুত চলে গেলেন প্রাসাদ-দ্বারে, দেখলেন, আজ্ঞামত ছন্দক সেখানে অপেক্ষা করছে ঘোড়া নিয়ে।

ঘোড়ায় চড়ে দ্রুতবেগে ছুটে চললেন তিনি। এত দ্রুত যে ভোর হবার আগেই ছাড়িয়ে গেলেন রাজ্যের সীমানা। সেখানে তলোয়ার দিয়ে নিজের কোঁকড়ানো চুল মুড়িয়ে ফেললেন। ছন্দককে বললেন সেগুলি ঘরে নিয়ে যেতে। আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে তিনি এক ভিখারীর সঙ্গে তাঁর রাজপোষাক বদল করলেন ; তারপর বেরিয়ে পড়লেন সন্ন্যাসীর বেশে। পাঁচজন অনুচর জুটলো এই রাজ-সন্ন্যাসীর। একসঙ্গে

তাঁরা সুরু করলেন উপবাস আর নানা ধরণের প্রায়শ্চিত্ত, সেকালের সন্ন্যাসীদের মত। বহুদিন কাটলো এ-ভাবে, কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। গৌতমের সন্দেহ হ'ল, এই পথে জ্ঞান লাভ করা যাবে না। তিনি জানালেন নিজের সন্দেহের কথা। স্পষ্টভাষায় বললেন, কৃচ্ছ্র-সাধনা আর জ্ঞান-সাধনা এক নয়। চাই কষ্ট সওয়ার ক্ষমতা নয়, চিন্তা করার ক্ষমতা, দেহকে কষ্ট দিলেই যে মনের চিন্তা একাগ্র হবে, তা নয়। সুজাতার তৈরী পায়সান্ন খেয়ে তিনি উপবাস ব্রত ভঙ্গ করলেন। এ

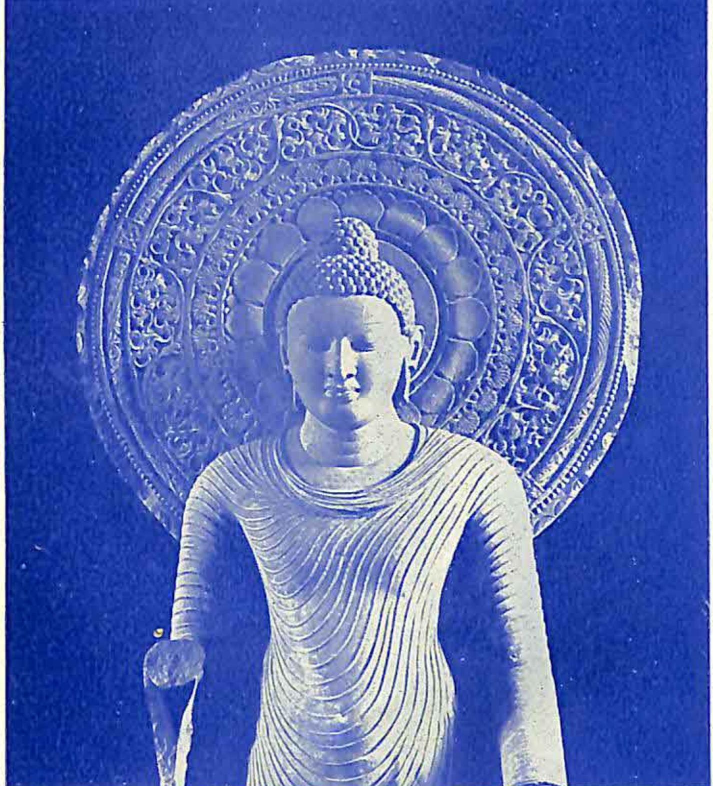


বুদ্ধকে সুজাতার পায়স নিবেদন

দেখে তাঁর অনুচরেরা মনে করলেন যে সাধনায় তাঁর নিষ্ঠা নেই। গুরু হবার অযোগ্য মনে করে তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন তাঁরা।

'গৌতম এবার নূতন জ্ঞান-সাধনা সুরু করলেন। একাকী তিনি গিয়ে বসলেন প্রাচীন সেই বোধিদ্রুমের নীচে। মগ্ন হলেন গভীর ধ্যানে। ধ্যান করতে করতে সহসা জীবনের পরম সত্য তাঁর চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো :—যদি তুমি দুঃখকে জয় করতে চাও,তবে নিজের জন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা কোরো না, পরের মঙ্গলের জন্য জীবন বিলিয়ে দাও। অন্তর তাঁর পূর্ণ হয়ে উঠলো আলোর প্রবাহে। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো সেই আলোর কিরণ।

প্রজ্ঞার আলোক—এই বোধি লাভ করে তিনি হলেন বুদ্ধ। তার পরে তিনি ফিরে এলেন লোকালয়ে, শান্তির এই রহস্য, গোপন কথা, সকলকে শোনাবার জন্য।) কাশীতে এসে তিনি তাঁর পঞ্চ অনুচরের সঙ্গে মিলিত হলেন। প্রথমে তাঁরা বিশ্বাসই করলেন না বুদ্ধের কথা। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন, তাঁর মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব আলোর আভা খেলা করছে, তাঁর কণ্ঠে শুনলেন এক গভীর প্রত্যয়ের সুর, তখন তাঁরা লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ে। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। শিষ্যদের কাছে তিনি



বোধি লাভের পর গৌতমের বুদ্ধ রূপ— কপিরাইট ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট

প্রথম যে উপদেশ দিলেন তার প্রথম কথা হ'ল, দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ কী? এই মহান উপদেশের সুরুতে এই কথাগুলি আছেঃ "জন্ম মানেই দুঃখ। ক্ষয় সে-ও দুঃখের। রোগ-ব্যাধিও দুঃখের আকর। মৃত্যুও দুঃখময়। আর, মানুষের কোনকিছু চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেও অনন্ত দুঃখ।"

তারপর প্রভু বুদ্ধ বললেন তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যের কথা। মানুষের দুঃখে তিনি দুঃখিত। মানুষকে তিনি জানাতে চান কেমন করে এই দুঃখের হাত থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে। মনে রেখ, বুদ্ধ কিন্তু কারো নাম নয়। খৃষ্টের মত বুদ্ধও একটি উপাধি, আর বুদ্ধদেব কখনও 'বুদ্ধ' নামে নিজের পরিচয় দেন নি।

মনের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে বুদ্ধদেব বারবার নিষেধ করেছেন। তিনি উপদেশ দিয়েছেন, ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় কর। মানুষকে শুধু অক্রোধী হবার উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি। কারণ অক্রোধ তো ক্রোধের অভাব মাত্র। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ কেবল মাত্র সহিষ্ণুতার চেয়ে আরও উঁচুতে উঠুক। শুধু ক্ষমা করুক তা নয়, ভালবাসুক। ভালবাসুক শুধু আপনজনকে নয়, শত্রুকেও। শত্রুকে ক্ষমা হয়তো কোনরকমে করা যায়। কিন্তু তাকে ভালবাসা! কিন্তু তার কমে বুদ্ধদেব সন্তুষ্ট নন। তিনি বলছেন, মা

যেমন তার একমাত্র সন্তানকে ভালবাসে, তেমনি তুমি তোমার শত্রুকে ভালবাসবে। শ্রেষ্ঠ মানুষের পক্ষেও প্রেমের এ-দাবী মেটানো শক্ত। কিন্তু মানুষের দুর্বলতার মাপে আদর্শকে তিনি খাটো করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন, যেন সকল মানুষকেই আমরা ভালবাসি। বুদ্ধের এই প্রেমের ডাক একদিন সাড়া জাগিয়েছিল সকলের মনে। দেশ-দেশান্তরের লোক শরণ নিয়েছিল এই ধর্মের। পৃথিবীর আকাশ–বাতাস মুখরিত করে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, "বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি" —বুদ্ধের শরণ লইলাম।

মানুষকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে পরিচালিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বুদ্ধদেব, তিনি কোন ধর্মমত বা দেব পূজার কোন বিশেষ পদ্ধতি প্রচার করেন নি। তিনি শুধু প্রচার করেছেন সেই পথের কথা, যে-পথে মানুষের জীবন মঙ্গলময় হবে। তিনি চেয়েছিলেন যে প্রত্যেক মানুষ নিজের মত করে সে পথ খুঁজে পাক। অন্ধের মত পরের চিন্তাধারার অনুসরণ করে মানুষ ভাল পথে চলুক, এ তিনি চাননি। তিনি বলেছেন, "নিজের উপর বিশ্বাস রাখ। তোমাকে দেবার মত কিছুই আমার নেই। নিজের চেষ্টায় তোমাকে সত্যে স্থির হতে হবে।" আমাকে মানো এই গুরু-সুলভ বাণী তাঁর নয়।

মানুষের উপর ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। তিনি বলেছেন বলেই কোন কাজ করতে হবে' এ তাঁর আদেশ নয়। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের মনের শুভবুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলতে। জোর করে কারো উপর কিছু চাপিয়ে দিতে তিনি চাননি। অন্যের মত মেনে চলার আগে মানুষ নিজেও চিন্তা করুক, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। তিনি বিশেষ করে বলছেন :"কোন কথা শাস্ত্রে লেখা আছে বলেই স্বীকার করে নিও না। 'হয়তো ভাল—এই অনুমান করেও মেনে নিও না কোন কথা। গুরু বলেছেন, অতএব এ-ই সত্য, এই মনোভাবেরও প্রশ্রয় দিও না। নিজে বুঝে নিজের মনে বিশ্বাস আনো।' গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নানাদিক দিয়ে ধর্মকর্মের ও জ্ঞান-ভক্তির, উপদেশ দিয়ে শেষে বল্‌লেন :- তোমায় ত আমি সবই বুঝিয়ে বল্লেম এখন তুমি যেমন বুঝেছ, যেমন ইচ্ছা কর, তেমন কর।

আমরা অনেকেই আমাদের অমূল্য সম্পদের কথা জানিনা। আমাদের ধারণা যে চিন্তার স্বাধীনতার জন্মভূমি হ'ল আধুনিক ইউরোপ। অবশ্য সঙ্কটের দিনে আমরা আমাদের এই উত্তরাধিকারের ঐশ্বর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। স্বাধীন চিন্তার পথ নূতন করে ইউরোপই আবার আমাদের দেখিয়েছে। সে-জন্য তাঁদের কাছে আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ।

বুদ্ধদেব নিজেও ছিলেন প্রচারক। আশী বছর বয়স পর্যন্ত এ-জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তিনি। সহরে, গ্রামে, অরণ্যে,—সর্বত্র তিনি ভ্রমণ করেছেন। রাজা ব্রাহ্মণ, সাধু-সন্ন্যাসী, পাপী-তাপী, উচ্চ-নীচ, বিভিন্ন ধরণের লোককে ধৈর্য



বুদ্ধের শান্তিপূর্ণ (গান্ধার স্থাপত্য অবলম্বন)

ধরে বুঝিয়েছেন তাঁর বক্তব্য, সন্ধান দিয়েছেন দুঃখ-নিবৃত্তির কোন্ পথ।

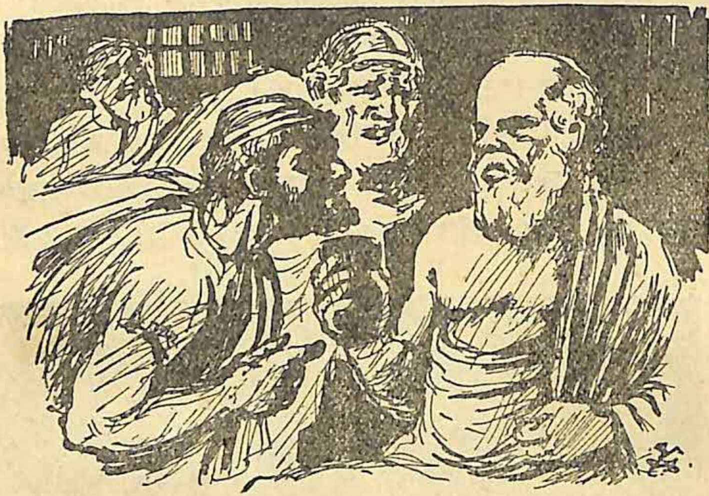
অবশেষে তিনি বিদায় নিলেন। একটি ছোট্ট গ্রামের শান্ত পরিবেশে ভবিষ্যতের হাতে শান্তি প্রচারের ভার তুলে দিয়ে তিনি চির-বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

বুদ্ধদেবের তিরোধানের কথা লিখতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণণ লিখেছেন, "বুদ্ধের জীবনের শান্তিময় পরিসমাপ্তির সঙ্গে সোক্রাটেস্ ও যিশুখৃষ্টের মৃত্যুর পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। সোক্রাটেস



খৃষ্টের দেহাবসানে শোক (যুগোশ্লাভিয়ার ছবি অবলম্বনে)

ও খৃষ্ট দুজনকেই তাঁদের দেশবাসীরা হত্যা করেছিল। এঁরা তিন জনেই সমসাময়িক ধর্মের অন্ধ-গোঁড়ামীকে কম-বেশী আঘাত করেছিলেন। আঘাত কিন্তু বুদ্ধই করেছিলেন সবচেয়ে বেশী।



বিষ পানে সোক্রাটেসের মৃত্যু

বৈদিক ধর্মের গোঁড়ামী আর অনুষ্ঠানের যতটা বিরোধিতা বুদ্ধ করেছি লেন, সোক্রাটেস এথেন্সের রাষ্ট্রীয় ধর্মের বা যিশু ইহুদী ধর্মের ততটা বিরোধিতা করেননি। এ-সত্ত্বেও ভারতবর্ষে বুদ্ধকে কোন নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি। দীর্ঘ আশী বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। বহু শিষ্য সংগ্রহ করেছিলেন। আর নিজের জীবিত কালেই একটি নূতন ধর্ম প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর কারণ হয়তো ধম সম্বন্ধে

ভারতবর্ষের দৃষ্টির উদারতা। প্রচলিত ধমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে অন্যদেশ যে চোখে দেখেছে ,ভারতবর্ষ সে-চোখে দেখেনি। প্রাচীন ভারতে স্বাধীন চিন্তার প্রতি অত বেশী পীড়ন ছিল না। ভারতবর্ষের এই উদার দৃষ্টি ভঙ্গির কথাটা সব-সময় তোমরা মনে রেখ। এ-কথা যাঁর জানা নেই তাঁকে শিষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিও কথাটা। ভারতবাসীরা ধর্মান্ধ, ভারতবাসীরা সাম্প্রদায়িক—এই অভিযোগের কোন প্রমাণ নেই ভারতের অতীত ইতিহাসে। মধ্যযুগের অসংখ্য সাধু-সন্তদের জীবনেও এর কোনও প্রমাণ নেই। আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতা এসেছিল এই হালের রাজনীতির সাথে সাথে। তোমাদের নিজ নিজ জীবনে এই প্রাচীন দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আবার আজকের যুগেও ভারতের সেই উদারতা তোমরা নূতন করে প্রমাণ কর।

শান্তির মূল ভিত্তি মৈত্রী বা শুভবুদ্ধি, সাধারণ ভিত্তি হল সহিষ্ণুতা। ধর্মের আসল উদ্দেশ্য যদি হয় মনের শান্তি, তবে আমাদের সকলেরই উচিত অন্যের মতকে সহ্য করা। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করতে হ'লে রাজনীতির ক্ষেত্রেও এই সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই সহিষ্ণুতার নামই হ'ল গণতন্ত্র। অবশ্য এই সহিষ্ণুতার নীতি সব সময়ে

বা সর্বত্র যে গণতন্ত্রে পালন করা হচ্ছেই তা নয় ; তবে আদর্শ স্থির হয়েচে, এটা ত নিশ্চয়।

অন্যের চিন্তাধারার অন্ধ অনুকরণ যেমন অন্যায়, তেমনি অন্যায় অন্যের চিন্তাধারাকে শ্রদ্ধা না করা। আগেভাগে চিন্তা না করলে কাজে বিশৃঙ্খলা ঘটে। অপরের চিন্তায় বাধা দিলেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তখনই সুরু হয় ভুল বোঝাবুঝির পালা। তার থেকে হানাহানি, এবং শেষে দু'পক্ষেরই সর্বনাশ। যদি আমাদের মতের মিল না-ই হয়, তাতেই বা কী? পরস্পরের মতের অনৈক্য মেনে নিয়েও এমন পথে চলা যায়, যাতে সকলেরই মঙ্গল হয়।

বৈষয়িক স্বার্থের বিরোধে ভয়ানক হানাহানি হয় ; নিছক মতের বিরোধেও কম কিছু হয় না। সব বিরোধের মধ্যেই মিলন সূত্র পাওয়া যেতে পারে—বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন মৈত্রীভাব দিয়ে। ভগবানের নিকট একটি প্রার্থনায় উপনিষদ বলেছেন : "তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন।" এই প্রার্থণার মঙ্গলবাণী রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় বারে বারে উল্লেখ করেছেন।

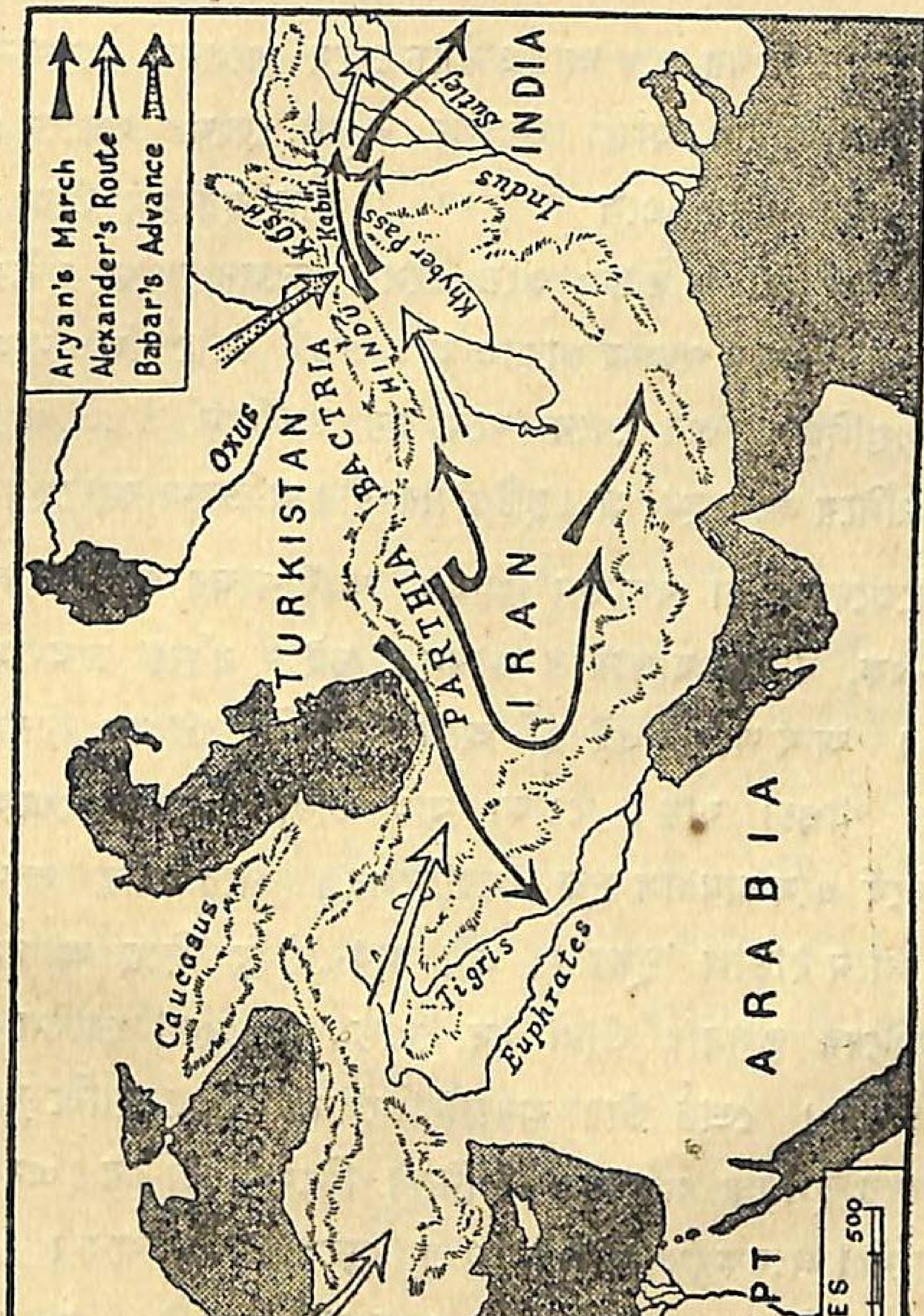
আর্য অধিকারের প্রসার

আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি ধরণের চিন্তা করতেন তার একটা মোটামুটি পরিচয় তোমরা পেয়েছ। তাছাড়া না জেনেও তোমরা সে চিন্তাধারার অনুসরণ করে চলেছ—তার প্রভাব যে রয়েছে তোমাদের রক্তে। পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে যে আধুনিক চিন্তাধারা আমরা লাভ করেছি সেটি আজ প্রবল হ'লেও, আমাদের প্রাচীন চিন্তাধারা এখনো দেশে বয়ে চলেছে; আর যেখানে এই দুটী ধারার মিলন হয়েছে, সেখানেই মঙ্গল হয়েছে, যেখানে হয়নি সেখানে আমরা বিপথে চলেছি।

যাক সে কথা। এবারে আমরা চিন্তারাজ্যের ইতিহাসের কথা ছেড়ে, ঘটনার ইতিহাস সুরু করবো—কেমন করে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভারতবর্ষ অধিকার করলেন, কি করে তাঁরা রাজত্ব গড়ে তুললেন তারই ইতিহাস। কিন্তু সে-সব ঘটনা কতদূর সত্য, তা প্রমাণ করা শক্ত। তাই খুব বেশী তর্কের ব্যাপারে না গিয়ে ঘটনার সেই মূল প্রবাহের আমরা অনুসরণ করবো, যার সম্বন্ধে সবাই প্রায় একমত। নিজেদের জানার জন্যই ভারতের ইতিহাস এই ভাবে আমাদের জানা দরকার।

এবারে আর্যদের অগ্রগতির কথা তোমাদের বলবো—কোথা থেকে তাঁরা ভারতে এলেন, কোথায় প্রথম ছাউনি গাড়লেন, ধীরে ধীরে কি ভাবে ছড়িয়ে পড়লেন, সেই সব কথা। ইতিহাসের পাঠ্য বই'এ যে-গুলিকে গম্ভীর ভাবে তথ্য বলে উল্লেখ করা হয়, সেগুলিকে আমরা ঠিক তথ্য বলে দাবি করি না। ঘটনাগুলি আলোচনা করলে যে-কথা মনে উদয় হয়, আমি শুধু তাই তোমাদের বলবো।

মানুষ সবাই এক। একথা তুমিও মান, যখন বল—মনুষ্যজাতি। তবু মানুষের মধ্যে আছে নানান ভাগ। নানা জাতিতে তারা বিভক্ত। আর্য জাতিও তেমনি একটি জাতি। তাঁদের পেসা ছিল শিকার করা। কিন্তু শিকার তো আর সব সময় জোটে না। তা-ছাড়া তাতে পরিশ্রমও অনেক। তাই সেই শিকারীর দল যাত্রা করলেন এমন এক দেশের সন্ধানে যেখানে তাঁরা সহজে খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন করে আরামে জীবন যাপন করতে পারেন। আর্যদের কয়েকদল এলেন পশ্চিম এশিয়ায়। খুব সম্ভব কাস্পিয়ান সাগর-অঞ্চল থেকেই তাঁরা এসেছিলেন। মিডিস্ নামে তাঁদের এক অংশ তাঁবু ফেললেন টাইগ্রীস-ইউফ্রেটিস উপত্যকায়। আমাদের পূর্বপুরুষেরাও কিছু কালের জন্য এই দলেই ছিলেন। তারপর



আর্য জাতির অগ্রগতি

তাঁরা ইরানীয় দলের সঙ্গে আরও নীচে নেমে এলেন। সেখান থেকে তাঁরা আবার যাত্রা করলেন নূতন দেশের সন্ধানে। কাবুল নদীর তীরে এসে কিছুদিন বিশ্রাম করলেন তাঁরা; তারপর সিন্ধু নদী অতিক্রম করে এসে পড়লেন "পঞ্চ নদীর তীরে"। এরপরে পঞ্চনদ ছাড়াও আর একটি ভৌগোলিক নাম পাই, সপ্তসিন্ধু। এর থেকে মনে হয় ততদিনে তাঁরা আর একটু এগিয়ে এসেছেন, আর দুটি নদীর তীর অতিক্রম করেছেন।

নিজেদের তাঁরা বলতেন আর্য। আর্য শব্দের মানে হ'ল দুটি—এক, যাঁরা যাতায়াত করেন; দুই, যাঁরা চাষবাস করেন। আর্য শব্দের এই দুটি অর্থের মধ্য দিয়ে তাঁদের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। বোঝা যায় তাঁরা বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে এসে চাষবাস সুরু করেছিলেন। পরে কিন্তু আর্য শব্দের মানে দাঁড়াল 'পূজ্য'। এই অর্থ-গৌরব দিয়ে আদিম অধিবাসীদের তুলনায় তাঁরা যে শ্রেষ্ঠ, এই কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠ তাঁরা অবশ্যই ছিলেন। কিন্তু দ্রাবিড়েরা যে তাঁদের তুলনায় সব বিষয়েই নিকৃষ্ট ছিলেন তা নয়। এমন কি আর্যেরা অনেক কিছু শিখেছেন দ্রাবিড়দের কাছ থেকে।

সে যা-ই হোক, আর্যেরা এ-দেশে বিদেশী। শুনতে হয়তো কথাটা অদ্ভুত লাগে, কিন্তু কথাটা সত্যি। কিন্তু এ-কথাও

সত্য যে, যার জন্য ভারতবর্ষ বিশ্বে সম্মান লাভ করেছে, তা এই আর্যদেরই দান। তাঁদের নামানুসারেই এই দেশের নাম হয়েছিল আর্যাবর্ত।

স্বাধীনতা লাভের পর যে শাসনতন্ত্র তৈরী হয়েছে, তাতে আমাদের দেশকে বলা হয়েছে, "ইণ্ডিয়া অর্থাৎ ভারত"। ইণ্ডিয়ার প্রাচীন নাম ছিল ভারত। এই 'ভারত' নামের একটু ইতিহাস আছে। প্রায় তিন হাজার পাঁচশ বছর আগে ভরত নামে এক রাজবংশ এ-দেশে রাজত্ব করতেন। ঋক্‌বেদে তাঁদের কীর্তি কাহিনীর উল্লেখ আছে। ঋক্‌বেদ আর্যদের প্রথম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সম্ভবতঃ ভারতে বসতি স্থাপন করার সময়ই আর্যেরা এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তাঁদের মহান চিন্তাধারা এবং শৌর্যবীর্যের পরিচয় আছে। এমন কি তাঁদের ছোটখাটো মানবিক দুর্ব্বলতার পরিচয়ও আছে এতে। এই গ্রন্থ তাঁদের জীবনেরই হুবহু প্রতিচ্ছবি। তা-ছাড়া এই ঋক্‌বেদই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ।

ঋকবেদ এবং অন্য তিনখানি বেদের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। কিন্তু আমরা অনেকেই সে গ্রন্থগুলি পড়িনি। তবে মহাভারত অল্প-বিস্তর আমরা সকলেই পড়েছি। কুরু এবং পুরু রাজবংশ দুটির কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছে এই মহাকাব্য।

পূর্বে এই দুইটি শাখা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পরে ভরত রাজবংশের মধ্যে দুই বংশধারার মিলন ঘটে। তারপর আবার সুরু হয় তাঁদের বিরোধ। ভরতবংশীয়দের মহাযুদ্ধই হ'ল মহাভারতের বিষয়বস্তু। মহাভারতেও আমরা ভরত নামে



কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের রথ চালনা

একজন রাজার কাহিনী পাই। আমাদের পুরাণগুলিতেও আমাদের দেশের প্রাচীন রাজাদের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। বিষ্ণু পুরাণে একটি শ্লোক আছে যার অর্থ, ভরত রাজার

বংশধরেরা যে দেশে বাস করেন, সেই দেশের নাম ভারত।

কোন্ পথে আর্যেরা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন? কেমন করেই বা তাঁরা ছড়িয়ে পড়লেন সমগ্র দেশে? তোমাদের কি মনে হয়?

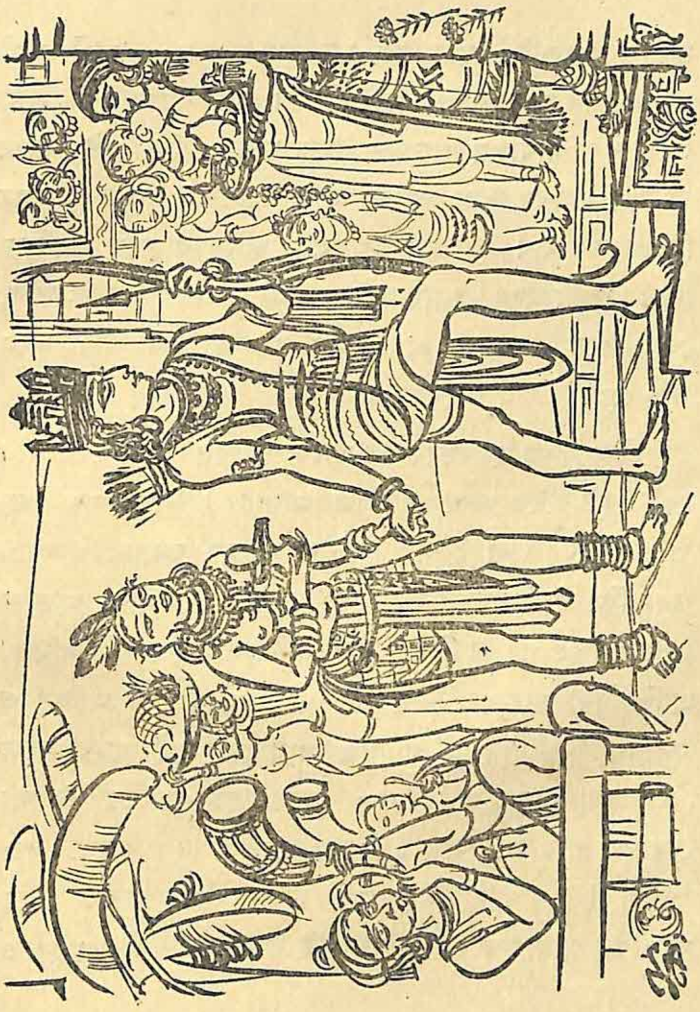
এ-বিষয়ে অবশ্য চিন্তা করার বিশেষ কিছু নেই। তাঁদের সঙ্গে কোন মানচিত্র নিশ্চয়ই ছিল না। যা মন চেয়েছে তাই করেছেন তাঁরা। তাঁদের ভারতে ঢোকার পথে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল হিন্দুকুশ পর্বত। সে যেন বলছিল, আর সামনে এগিও না। তুটি পথ খোলা ছিল তাঁদের সামনে—হয় ফিরে যাওয়া, নয়তো হিন্দুকুশের বাধা অতিক্রম করা। এ-ক্ষেত্রে তুমি আর আমি যা করতাম, তাঁরাও তাই করলেন। তাঁরা খুঁজে পেতে দেখতে লাগলেন কোথায় পাহাড়ের উচ্চতা কম, কোথাও সরু কোন গিরি-পথ আছে কি না পেরিয়ে যাবার। খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা পেয়ে গেলেন কাবুল উপত্যকা আর খাইবার গিরি-পথ। সেই পথ দিয়েই এলেন তাঁরা ভারতবর্ষে।

এইভাবেই ভারতবর্ষে তাঁদের অধিকারের সীমানা বেড়ে চললো তাঁরা খুঁজছিলেন এমন দেশ যেখানে সহজে প্রচুর খাদ্য-দ্রব্য পাওয়া যাবে। তা-হ'লে ধরে নিতে পার, নদীর অববাহিকাই হ'ল তাঁদের সেই সাধের দেশ। তখনকার দিনে

যান-বাহন বা আমদানী-রপ্তানী ব'লে কোন কথাই ছিল না। গাড়ীই বা তখন কোথায়, আর তা চলাচলের রাস্তাই বা কোথায়। তাই বসতি হিসাবে নদীর তীরই ছিল সব চেয়ে ভাল জায়গা। সেখানে যেমন মিলতো খাবার, তেমনি মিলতো জল। আর ক্লান্তিকর যাত্রা পথে এই দুটির একটিকেও বাদ দিয়ে পথ চলা যায় না।

আর্যেরা ভারতে এসে দেখলেন এ দেশে তখন অন্য এক জাতির আধিপত্য। তাঁরা ভাবলেন এঁরাই হয়তো এই দেশের আদিম অধিবাসী। তাই নবাগত আর্যেরা তাঁদের নাম দিলেন 'দাস'—মানে 'দেশজ'; কোন কোন পণ্ডিতের এই মত। কিন্তু তাঁরাও ছিলেন আর্যদেরই মত বিদেশী। অবশ্য তাঁরা আর্যদের পূর্বে এদেশে এসেছিলেন, এই যা তফাৎ। আর যাই হোক্, আর্যপূর্ব ভারতীয় সভ্যতাকে আগন্তুক আর্যেরা নষ্ট ত করেনই নি বরং অনেকাংশে গ্রহণ করেছিলেন।

কি ভাবে আর্যেরা ভারতবর্ষ দখল করলেন, সে কাহিনীও সহজ, সরল। কোন বাড়িতে বাস করার সময় লোকেরা যা করে তাঁরাও তাই করলেন। সব চেয়ে ভাল ঘরগুলি পায় বাড়ির কর্তা ব্যক্তিরা। ছেলেমেয়েরা পায় তার পরের ঘরগুলি। দূর আত্মীয়দের ভাগ্যে জোটে যেমন-তেমন ঘর। আর সব চেয়ে



অনার্য-পত্নীর সাথে সাথে অনার্য দেবতার আর্য-গৃহে আগমন

খারাপ ঘরগুলি দেয়া হয় চাকর-বাকরদের। দামী দামী আসবাবপত্রও থাকে ভাল ঘরগুলিতে। আজেবাজে জিনিসগুলি জড়ো করে রাখা হয় অন্ধকার গুদাম ঘরে। ঠিক সেই ভাবে আর্যেরা দেশের ভাল অংশ ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিলেন নিজেদের মধ্যে। তুলনায় অনুর্বর দক্ষিণ প্রদেশে তাড়িয়ে দিলেন দ্রাবিড়দের। আদিবাসী আর আদি-দ্রাবিড়, কোল, ভীল, গোণ্ডা প্রভৃতিদের দূর করে দিলেন বন্ধ-করা গুদামঘরে, মানে পাহাড়ে আর জঙ্গলে ঘেরা জায়গায়।

কিন্তু সকল দ্রাবিড়কে এ-ভাবে তাড়িয়ে দেয়া গেল না। কেউ কেউ টিঁকে থাকলেন নিজের জায়গায়। কারণ যুদ্ধ করা আর শত্রুদের বাধা দেবার কৌশল তাঁদের অজানা ছিল না। এমন কি তাঁরা নগর পর্যন্ত নির্মাণ করেছিলেন, যা আর্যেরা তখন পর্যন্তও পারেন নি। কোথাও বা আবার কোন আর্যদল দ্রাবিড়দের সাহায্য নিয়ে অন্য আর্য দলগুলিকে আক্রমণও করতেন। তারপরে ধীরে ধীরে আর্য এবং দ্রাবিড়দের মধ্যে বিবাহপ্রথা চালু হ'ল। তার থেকে দুই জাতির উপাস্য দেবতাও প্রায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলেন। আর্যদের শূদ্র পত্নীরা বিয়ের পরে পিতৃগৃহের উপাস্য দেবতাকেও নিয়ে আসতেন স্বামীর ঘরে। এই ভাবেই আর্য ধর্মে শিব এবং আরও

অন্যান্য দেবতার আসন পাকা হ'ল। আর্যদের মন-গড়া স্বর্গে এই সব দেবতাদেরও স্থান করে দিতে হ'ল।

মানুষ যখন কাছাকাছি এবং পাশাপাশি থাকে তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান ঘটতে বাধ্য। ধর, তোমার কোন জ্যাঠতুতো কি খুড়তুতো ভাই গ্রামের প্রাইমারী স্কুল থেকে পাশ করে সহরে এসেছে তোমাদের বড় স্কুলে পড়তে। তোমাদের বাসাতেই সে থাকে। তোমাদের ছোট, সুন্দর, পরিপাটি করে সাজানো বাসাটি তার ভাল লাগবে সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মন টানবে গ্রামের পুকুর, গাছ-পালা আর পক্ষী-পতঙ্গ। মাঝে মাঝে সে সহরতলীতে বেড়াতে যাবে প্রকৃতির সঙ্গ লাভের জন্য। তুমি পাক্কা সহুরে ছেলে, প্রকৃতির স্পর্শ লাভের অভাব এমন করে কখনও তুমি বোধ করনি। এ-কথা ভাবনি পর্যন্ত। কিন্তু মাস তিনেক তার সঙ্গে থাকার পর তুমিই হয়তো তাকে তোমার সঙ্গে বন-বাঁদাড়ে বেড়াতে যেতে বলবে। তোমারও হয়তো তখন ভাল লাগবে ছোট ডোবার ধারে বসে থাকতে। তোমার ভাইয়েরও অনেক পরিবর্তন ঘটবে—সে-ও অনেকটা সহুরে আদব-কায়দা আয়ত্ত করে ফেলবে। তোমার দেখাদেখি সে হয়ত দাঁতন ছেড়ে বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজা ধরবে। তোমাদের দু'জনেরই

প্রভাব পড়বে ছু'জনের উপর। এই ভাবেই আর্য আর অনার্যেরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন।



পিতা মনু—তাঁর ছু'টি মন্ত্র, শান্তি ও ঐক্য

ঋগ্বেদে যাঁকে পিতা মনু বলা হয়েছে, তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম আর্য-অভিযান পরিচালনা করে থাকবেন। তবে তিনি ভারতের সীমান্তে এসেই থেমে গিয়েছিলেন। বর্তমান কাবুল নদীর তীরেই তিনি স্থাপন করেছিলেন তাঁর রাজধানী। প্রথম আর্য রাজ্য হ'ল কাবুলে। কোন এক পণ্ডিতের মতে রাজা মনুর রাজধানীর নাম ছিল প্রতিষ্ঠানপুর। আর্যদের প্রথম প্রতিষ্ঠা সেইখানে। এই প্রতিষ্ঠান শব্দই কালক্রমে হ'য়ে দাঁড়াল পাঠান। অগ্রগতির দ্বিতীয় ধাপে আর্যেরা এসে পোঁছলেন সিন্ধুর উত্তর উপত্যকায়। এলেন দলে দলে নূতন লোক। তাই যাঁরা আগে এসে পৌঁছেছিলেন তাঁরা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন এগিয়ে যাবার জন্য। তারপর আর্য উপনিবেশ স্থাপিত হ'ল প্রাচীন সরস্বতী আর দৃশদ্বতী নদী দু'টির মধ্যবর্তী ভূ-খণ্ডে। সেই সরস্বতী নদীর আজ কোন চিহ্ন নেই। দৃশদ্বতী অবশ্য এখনও অতি ক্ষীণ ধারায় বয়ে চলেছে। বর্তমান শতদ্রু আর যমুনার মাঝামাঝি জায়গায় ছিল এই নদী দু'টি। এই খানেই ভরত রাজবংশ তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেন। এই স্থানই সেকালে ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল। বৈদিক জীবন ধারা এই খানেই সর্বপ্রথম উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে। 'ভারতীয় সংস্কৃতি' বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে হয়তো

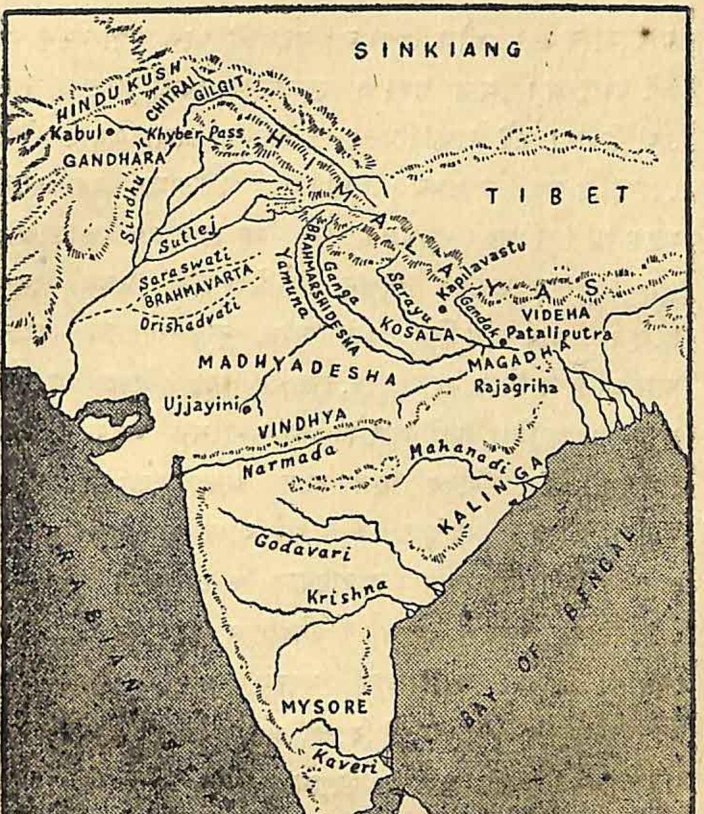
পরিষ্কার কোন ধারনা তোমাদের নেই, কিন্তু ও-কথাটা নিশ্চয়ই অনেকবার শুনেছ তোমরা। এই 'ভারতীয়' সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়েছিল ব্রহ্মাবর্তে।

একটি কথা বলে রাখি এখানে। সংস্কৃতি আর সভ্যতা মানে কিন্তু এক নয়। সংস্কৃতি হ'ল মনের ঐশ্বর্য, আর সভ্যতা হ'ল বাইরের উন্নতি। সভ্যতা আমাদের জীবনযাত্রার মান উঁচু করে, আমাদের ভাল ভাবে বাঁচতে শেখায়। আর সংস্কৃতি আমাদের মনকে বড় করে তোলে। বড় বড় কথা ভাবতে শেখায়। একটা উদাহরণ দিলে আরও ভাল করে বুঝতে পারবে কথাটা। ধর, একজন লোকের বেশ হাল ফ্যাশনের একখানা বাড়ী আছে। আর আছে নানা দামী দামী আসবাবপত্র—এ-সবই হ'ল সভ্যতার দান।

যদি দেখ তাঁর বাড়িতে ভাল ছবি, ভাল বই বা অন্য কিছু ভাল শিল্পের কাজ রয়েছে তবেই তাঁর মনে সংস্কৃতি আছে বলা চলবে। লোকটি যত বড়ই হোন, যদি দেখ তিনি সাধারণ লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় এবং ব্যবহারে বেশ ভদ্র এবং বিনয়ী তবেই বুঝবে যে সংস্কৃতি তাঁর হৃদয়েও রয়েছে।

এবারে যে-কথা বলছিলাম সে-কথায় ফিরে যাই। আর্যেরা ব্রহ্মাবর্ত থেকে কিছুকালের মধ্যেই ভারতবর্ষের একেবারে

আর্য অধিকারের প্রসার



আর্য অধিকারের প্রসার

মাঝামাঝি এসে পৌঁছে গেলেন। সরস্বতী থেকে গঙ্গা-যমুনা হল এই মধ্যদেশ। আর গঙ্গা ও যমুনার অন্তঃবর্তী অংশের নাম ব্রহ্মর্ষিদেশ। এই ব্রহ্মর্ষিদেশে বেদের মন্ত্র রচনা সমাপ্ত হ'ল। বেদের ব্রাহ্মণভাগ তখনও লেখা চলছে। 'ব্রাহ্মণ' হল বেদের মন্ত্রগুলিরই বিশদ ব্যাখ্যা। উপনিষদ লেখারও তোড়জোড় সুরু হয়েছে তখন। প্রধান উপনিষদগুলি তখন লেখা হচ্ছে। আর্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র তখন কুরু-পাঞ্চাল থেকে আরও পূর্ব্ব দিকে সরে গেছে, কোশল এবং বিদেহ রাজ্যে। কুরু-পাঞ্চাল ছিল দিল্লী-লক্ষ্ণৌর আশেপাশের অঞ্চল। আর কোশল এবং বিদেহ ছিল সরযূ আর বর্তমান গণ্ডক নদীর তীরে অবস্থিত। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং রাজর্ষি জনকের কথা নিয়ে লেখা বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এই বিদেহ অঞ্চলে লেখা। বিহারের চম্পারন, গান্ধীজি যেখানে প্রথম আন্দোলন করেন, তার প্রাচীন নাম চম্পকারণ্য, সে-ও ছিল এই বিদেহ অঞ্চলের ঋষিদেরই একটি বড় আশ্রম। মহাভারতে এর উল্লেখ আছে।

এই সব দেশ নিয়েই শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল প্রাচীন আর্যাবর্ত। এর উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত, পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বত আর আরব

সাগর। আর্যাবর্ত নামটি মনুর দেওয়া। মনে রেখ মনু নামে মাত্র একজন লোকই ছিলেন না। এখানে যে মনুর কথা বলছি তিনি হলেন মনুস্মৃতির লেখক। হিন্দু সমাজ আচার-বিচারে এই গ্রন্থের বিধানই মেনে চলতো। তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল সম্ভবতঃ মৌর্য রাজত্বকালে, বেদের যুগের অনেক পরে।

বৈদিক যুগের সর্বপ্রথম রাজাই বোধহয় প্রথম মনু। এঁর কথা আগেও তোমাদের বলেছি। কাবুল নদীর তীরে ইনিই প্রথম আর্য রাজত্ব স্থাপন করেন। তিনি হলেন প্রথম আর্যদলের প্রথম দলপতি। মানব শব্দের অর্থ হ'ল "মনুর সন্তান-সন্ততি" বা "মনুর দলবল"। যে সব আর্যেরা মনুর অধীনে ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁদের বলা হ'ত 'মানব'। এঁকেই ঋগ্বেদে 'পিতামনু' বলা হয়েছে। আর যে সব আর্যেরা তাঁদের আদি বাসস্থানে থেকে গেলেন তাঁদের বোধ হয় বলা হ'ত 'দেব' ও বাসস্থানকে বলা হ'ত 'দিব্', দিব্য-লোক, যার চলিত নাম স্বর্গলোক।

ঋগ্বেদের প্রথম দিকের মন্ত্রগুলিতে দেখা যায় যে 'দেব'-দের সঙ্গে 'মানব'দের যোগাযোগ ছিল। হ'লই বা অনেক দূর, তাই বলে কি রক্তের সম্বন্ধ সহজে মুছে যায়! 'দেব'গণের সম্মানে মাঝে মাঝে মানবগণ যজ্ঞ করতেন। সেই যজ্ঞে

যোগদান করার জন্য দেবগণ আসতেন ভারতবর্ষে, আর যুদ্ধেও সাহায্য করতেন। ইন্দ্র, অগ্নি এবং বরুণের উদ্দেশ্যে যে-সব প্রার্থনা-মন্ত্র আছে তার মধ্যে এই সব ইতিহাসের ছিঁটেফোঁটা ছড়িয়ে আছে। মন্ত্রগুলি পড়লে মনে হয় 'দেবতা'রা 'মানব'দের নিকট আত্মীয়, ভাই ভাই। বিশেষ করে ঋগ্বেদের প্রাচীন মন্ত্রগুলিতে যে দেবতাদের আবাহন করা হয়েছে তাঁদের বলা হয়েছে, 'ভাই', 'বন্ধু', 'শুভানুধ্যায়ী'। তাঁরা অশরীরী দেবতা হয়ে গেলেন অনেক পরে যখন বেদ বেশী পুরানো যুগের ব্যাপার হল, ও তার অর্থও ভুল হতে লাগলো, কে যে আসল ইন্দ্র, কোন দেবতাকে পূজা করতে হবে এসবও গুলিয়ে গেল। স্বর্গও বেদের প্রথম যুগে সম্ভবতঃ মাটির দেশই ছিল। এমন কি মহাভারতে ও দেখা যায়, পাণ্ডবগণ যে স্বর্গারোহণ কচ্চেন তা যোগ বলে নয়, পায়ে হেঁটে চলেছেন তাঁরা।

ঋগ্বেদের পিতা মনু দুটি আদর্শের কথা বলেছিলেন—শান্তি আর একতা। বৈদিক আর্য প্রার্থনা করতেন, "পিতা মনু যে পথ আমাদের দেখিয়েছেন, সে-পথ থেকে যেন আমরা ভ্রষ্ট না হই।" কিন্তু কতদিন লোকে আদর্শ মেনে চলতে পারে? (এই তো এরই মধ্যে আমাদের প্রায় প্রতিদিনই মনে করিয়ে দিচ্ছেন নেতারা—গান্ধীজির পথ ভুল না।) তবু জাতির

সামনে একটা মহান আদর্শ থাকা খুবই বড় কথা। অনেক অনেক শতাব্দী পরে আজকে আবার শোনা যাচ্ছে শান্তি আর একতার কথা। দুইটি বিশ্ব যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মানুষ শান্তি আর একতা প্রতিষ্ঠার জন্য গড়ে তুলেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠান—ইউনাইটেড নেশনস্ অরগানিজেসন।



বেদে বর্ণিত রাজা সুদাসের যুদ্ধ

ভরত রাজবংশের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ কমে যায়। তখন কুরু বংশ খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। কুরুবংশ আর্যদেরই একটি নূতন শাখা। তাঁরা সম্ভবতঃ চিত্রল ও গিলগিটের পথে এসে দিল্লী এবং কাশ্মীর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। ইতোমধ্যে পুরু বংশীয়েরা ভরতদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। আবার ভরতরা এসে মিললেন কুরুবংশের সঙ্গে। কুরু বংশের সঙ্গে পাঞ্চাল বংশের বেশ বন্ধুত্ব ছিল। এই পাঞ্চালরা বসতি স্থাপন করেছিলেন সিন্ধু আর চিনাব নদীর অঞ্চলে। বতমান বেরিলী এব ফরক্কাবাদ পর্যন্ত তাঁদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। পাঞ্চাল নাম থেকেই বেশ বোঝা যায় যে এঁরা ছিলেন মিশ্র জাতি, যাকে বলে পাঁচ-মেশালি। পাঁচটি জাতের মিশ্রণও হ'তে পারে, বা কয়েকটি জাতের মিশ্রণও হ'তে পারে। পরে কিন্তু কুরু-পাঞ্চালের এই মিত্রতা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আরম্ভ হ'ল কুরু-পাঞ্চালের যুদ্ধ। যজুর্বেদে এই যুদ্ধের বর্ণনা আছে। মহাভারতের মহাকবি এই যুদ্ধেরই নাম দিয়েছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। মহাভারতের এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডবদের অধিনায়ক। পাণ্ডবেরা পাঞ্চালের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই যুদ্ধে কৌরবদের পরাজিত করেন।

মহাভারতেই প্রথম শ্রীকৃষ্ণকে দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শিবের 'মহাদেব' এবং 'মহেশ্বর' নামও মহাভারতেই সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে বৈদিক যুগের একটি যুদ্ধের ঘটনা অবলম্বন করে লেখা হলেও, এর রচনা কালে বৈদিক আবহাওয়া অনেক বদলে গিয়েছিল। কারণ বেদের প্রধান দেবতা হলেন ইন্দ্র। কিন্তু মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ এবং শিবেরই প্রাধান্য। দেবতাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং শিবের এই প্রাধান্য লাভ বেদের বহু শতাব্দী পরের ঘটনা। এই ধরনের যুগ-পরিবর্তন আরও অনেক ঘটেছে ইতিহাসে।



উমা-মহেশ্বর (হেমাবতী স্থাপত্য)

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে শুধু দেবতা নয়, মানুষ এবং রাজা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রও তাই—তিনিও মানুষ এবং দেবতা দুই-ই। শুধু যে পুরাণ কাহিনীর বেলায় এটা ঘটেছে তা নয়। ইতিহাসেও এর নজীর আছে। রাজপুত্র সিদ্ধার্থও তো মানুষ। কিন্তু পরে তিনিই হলেন ভগবান বুদ্ধ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে দু'জন বড় রাজার নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন রাজা পরীক্ষিত এবং রাজা জন্মেজয়। এঁরা দু'জনেই রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ হল অন্যান্য রাজাদের উপর আধিপত্যের প্রমাণ।

এঁদের পরে অনেককাল যাবৎ ভারতবর্ষের আর কোন ইতিহাস পাওয়া যয়ে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেটা অন্ধকার যুগ। তারপর আবার যখন যবনিকা উঠলো তখন ইতিহাসের ভৌগোলিক কেন্দ্র সুদূর পশ্চিম কুরুক্ষেত্র থেকে সরে পূর্বদেশ কোশল ও মগধে এসে পড়েছে। রাজা বিম্বিসার বসেছেন মগধের সিংহাসনে। মগধ সাম্রাজ্যের তখন অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তি। বিদেহ রাজ্য ইতিহাসের আলো-ছায়ায় কিছুকাল মিট্-মিট্ করে তার আগেই মিলিয়ে গেছে। উপনিষদ যুগের জনক ছিলেন এই বিদেহ রাজ্যেরই একজন

প্রাচীন রাজা। রামায়ণের জনক রাজা এই বংশেরই একজন পরবর্তী রাজা। ইচ্ছা করলে তোমরা তাঁকে দ্বিতীয় জনক আখ্যা দিতে পার।

বিদেহের পতন আর মগধের উত্থানের মধ্যে ছোট ছোট কতকগুলি গণতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। এ-সব রাষ্ট্রে কোন রাজা ছিলেন না। রাজ্য পরিচালনার ভার ছিল প্রজাদের গড়া লোকসভার হাতে। কপিলাবস্তুর শাক্যরাও এই ধরণের একটি ছোট রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। এই বংশেই রাজপুত্র সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। আর একটি ছোট গণ-রাষ্ট্র ছিল লিচ্ছবি কুলের। এঁদের রাজধানী বৈশালী নগরে বুদ্ধদেব এসে তাঁর দুঃখ-নিবৃত্তির ধর্ম প্রচার করেন। এই ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি পরে অবন্তী আর কোশল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তার পরেই হ'ল মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়। পুরাকালের কোন সময়েই অনেক রাজ্যকে এক শক্তিশালী রাজ্যের অনুগত করে ভারতের ঐক্য রচিত হয় নি। সেকালের ভারত ছিল এক সংস্কৃতির গাঁটছড়া।

মগধ অঞ্চলের বেশীর ভাগ লোকই ছিল অনার্য। এদের একটি শক্তিশালী শাখার নাম ছিল 'কিকট'। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের কিছু আর্য উপনিবেশও ছিল এখানে। কিন্তু তাদের কেউ বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতো না। অবশ্য স্থানীয়

অনার্যেরা যে আর্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মেলামেশা করতো না তা নয়। জাতি সংমিশ্রণের ফলে আর্য-অনার্য প্রতিভার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। মগধের রাজারা ছিলেন জাতিতে শূদ্র। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই বিষয়টিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত রাজারাই ছিলেন ক্ষত্রিয়। মগধ সাম্রাজ্যেই প্রথম সেই ধারার ব্যতিক্রম ঘটলো। মগধ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন রাজা বিম্বিসার। হিন্দু ধর্মের গণ্ডীও ভাঙ্গলেন তিনি। মহাবীর জৈন ও গৌতম বুদ্ধ দু'জনেই মগধে এসে রাজা বিম্বিসারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। প্রথম দিকে বুদ্ধের বাণী অনেক সাধারণ লোক মন দিয়ে শুনেছিল। রাজাদের মধ্যে মগধের বিম্বিসারের বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা এক মস্ত বড় ঘটনা। 'নৃপতি বিম্বিসার নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল পাদ নখ কণা তাঁর।' দুই শতাব্দীর ব্যবধান হ'লেও অশোকের জন্যই যেন পথ প্রস্তুত করে রেখে গেলেন বিম্বিসার।

তার পর চন্দ্রগুপ্ত আবার নূতন করে মগধের সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর পৌত্র অশোক এই মগধ সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তৃত করেন। বৌদ্ধধর্মকে তিনি বিস্তৃত করেন প্রায় সারা পৃথিবীতে। শুধু চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, আফগানিস্থান, জাভা ঈজিপ্ট, বর্মা, শ্যাম দেশই নয়, ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক

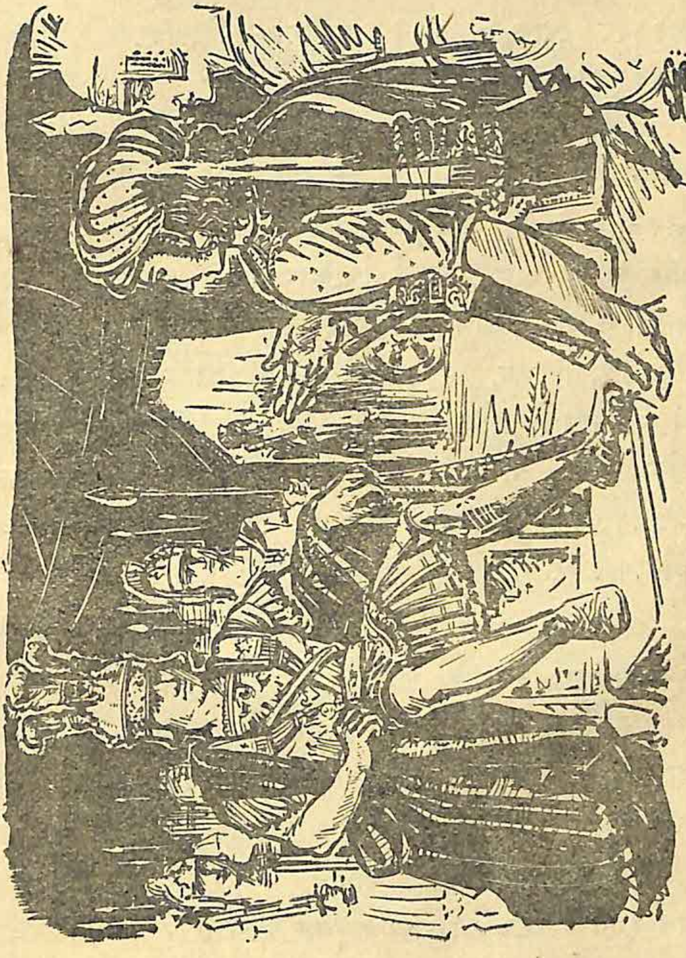
পূজাপার্বণের উপরও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পড়েছিল। পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত যে ভারত-জোড়া সাম্রাজ্য রেখে গিয়েছিলেন তার অপূর্ব সদ্ব্যবহার করেছিলেন অশোক। সে বিরাট সম্রাজ্যের শান্তি এবং শক্তি যে কাজে তিনি লাগিয়েছিলেন, তার চেয়ে বড় কোন কাজের কথা কল্পনাও করা যায় না। তিনি যে কেবল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের মধ্যে বিশেষ একজন তা-ই নন ইতিহাসে যাঁরা যুগান্তর এনেছেন তাঁদেরও তিনি পুরোভাগে। আর, যদি বলা যায়, বিদেশী শাসককে 'ভারত ত্যাগ' (Quit India) করাতে চন্দ্রগুপ্তই প্রথম, তবে এও বলা যায়, ভারতের নেতৃত্বে পৃথিবীর মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রীতি স্থাপনে অশোকই প্রথম।

সম্রাট অশোক

দিগ্‌বিজয়ী আলেকজান্দারের কাছে একদিন একজন মৌর্য যুবক গিয়ে উপস্থিত। গ্রীক বীরের সঙ্গে তাঁর কী যে কথা হয়েছিল তা কেউ জানে না। বিখ্যাত লাতিন লেখক জাস্টিন ও প্লুতার্ক ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখতে গিয়ে এই সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেছেন। যুবকের কথাবার্তায় মাসিডনের অধিপতি মোটেই সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি আজ্ঞা দিলেন যুবকটির মাথা কেটে নেবার। কিন্তু সময় থাকতে পালিয়ে যাওয়ায় যুবকের মাথা শেষ পর্যন্ত যথাস্থানেই থেকে গেল। বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্দারের মুখে মুখে কথা বলতে একটুও ভীত হননি যে যুবক, তাঁরই পৌত্র হলেন অশোক।

কে এই নির্ভীক যুবক? এঁর নাম চন্দ্রগুপ্ত। লাতিন লেখকেরা তাঁর নামটি ঠিক মত উচ্চারণ করতে পারেন নি। প্লুতার্ক চন্দ্রগুপ্তকে বলেছেন আন্দ্রোকোট্টাস। জাস্টিন আর স্ট্রাবো বলেছেন সান্দ্রোকোট্টাস। অন্য একজন লাতিন লেখক কতকটা ঠিকঠাক লিখেছেন নামটা। তাঁর লেখায় চন্দ্রগুপ্ত হয়েছেন সান্দ্রোকোপ্তস।

এই চন্দ্রগুপ্ত শিকারী আর দস্যুদের নিয়ে একটি বিরাট সৈন্য-বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর

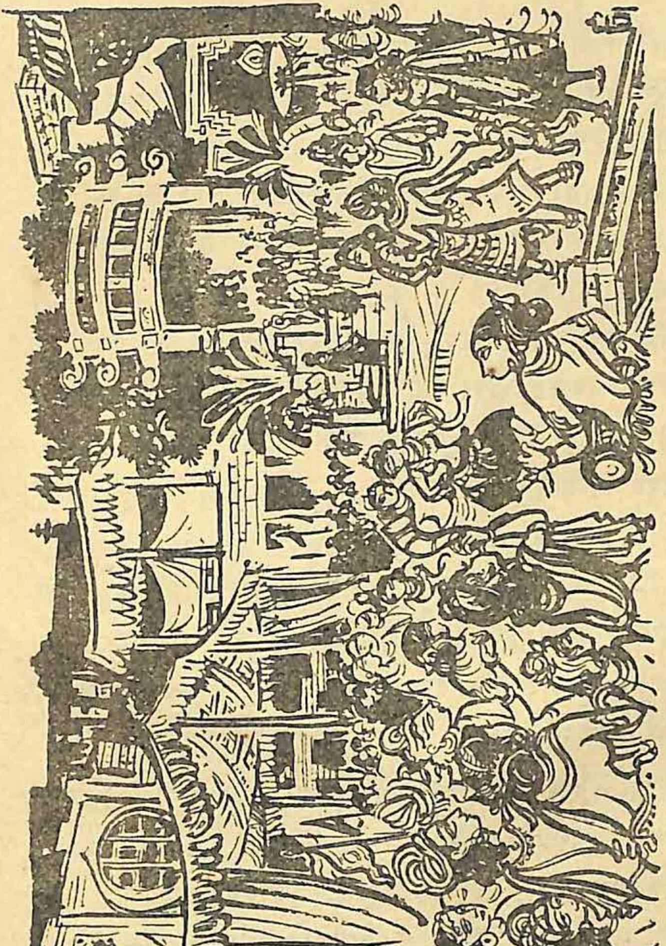


আলেকজেন্ডার এবং চন্দ্রগুপ্ত

ভারতবর্ষ থেকে তিনিই তাড়িয়ে দিয়েছিলেন গ্রীক শাসনকর্তাদের।

ভারতবাসীরা গ্রীকদের বলতেন 'যবন'। এই 'যবন' কথাটি থেকেই সংস্কৃত নাটকের 'যবনিকা' কথাটি এসেছে। গ্রীক নাট্য-সাহিত্য ছিল খুবই উন্নত। আমাদের পূর্বপুরুষেরা গ্রীক নাটক এবং ভাস্কর্য থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন। পারস্য ও পশ্চিম এশিয়ার গ্রীকদের কাছে থেকে তাঁরা যে শিল্প-রীতি শিখেছিলেন, তা-ই গান্ধার শিল্পকলা নামে বিখ্যাত। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সভ্যতায় খুবই উন্নত ছিলেন। পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারে অনেক কিছু দান করেছেন তাঁরা। কিন্তু তা বলে অন্য দেশের যা-কিছু ভাল, তা হাত পেতে নিতে তাঁরা একটুও কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রের বাহার ছিল কত! সহরে ঢুকবার তোরণই ছিল চৌষট্টিটি। রাজপথগুলি ছিল যেমন চওড়া তেমনি ঝকঝকে। মন্দিরও ছিল অজস্র। উৎসবের রাতে সারা পাটলিপুত্র সাজান হ'ত আলোর মালায়, আমাদের দেওয়ালি উৎসবের মত। স্বাস্থ্য পরিদর্শককের উপর ভার ছিল সহরটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার। খালের জল যাতে ঠিক মত চলাচল করে তা দেখার জন্য আলাদা একটা সরকারী



উৎসবে মত্ত ও মুখর পাটলিপুত্র—নাচ ও নাটক

বিভাগই ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে যাতে চুরি-জুয়াচুরি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতেন আর একদল কর্মচারী। গ্রীকরাও এই নগরীর ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্যের শতমুখে প্রশংসা করেছেন। নানান দেশের লোকেরা সাগ্রহে আসতেন এই সহর দেখতে। বিভিন্ন বিদেশী রাজ্যের সঙ্গে মৌর্য সাম্রাজ্যের হৃদ্যতার কিছু অভাব ছিল না।

শুধু সহর নয়, সহরের বাসিন্দাদের দেখলেও আনন্দ হ'ত। সেজেগুজে কেউবা তারা খুসী মনে কেনা-কাটা করে বেড়াচ্ছে, কেউবা চলেছে কোন উৎসবে যোগ দিতে। সহরে আনন্দ উৎসবের আয়োজনও ছিল প্রচুর। নাটক, নাচ-গান, ঘোড়-দৌড়, রথের পাল্লা, একটা না একটা কিছু লেগেই থাকতো। তাই বাঁচার আনন্দ কাকে বলে পাটলিপুত্রের নাগরিকদের তা অজানা ছিল না। স্বভাবও ছিল তাদের তেমনি মধুর ; মিথ্যা কথা বলা বা চুরি করা তো দূরের কথা, সে-কথা ভাবতে পর্যন্ত পারতো না তারা।

বাজারও থাক্‌তো নানা পণ্যে ভরা। কী না পাওয়া যেত সেখানে ? রেশম, মসলিন, হরেক রকম নক্সার কাজ, ইস্পাতের তলোয়ার, হাতির দাঁতের জিনিস, গন্ধদ্রব্য, রত্ন-অলঙ্কার সব কিছুই দোকানে সাজান থাকতো থরে থরে।

মেয়েরা তো কাপড়-চোপড়ের তুলনায় অলঙ্কারই বেশী পরতেন। তখনকার দিনে অলঙ্কার পুরুষেরাও অবশ্য কিছু কম পরতেন



মাদ্রাজ মিউজিয়ামে রক্ষিত স্থাপত্য

না। কান-পাশা, অনন্ত আর কণ্ঠহার তাঁরাও হামেশাই ব্যবহার করতেন। সাধারণতঃ কাপড় বলতে পুরুষেরা পরতেন কোমরে কটি-বাস আর গলায় উত্তরীয়। উত্তরীয় তাঁরা উপবীতের মত করে গায়ে জড়িয়ে নিতেন। যেমন ছবিতে দেবমূর্তিটির ডান হাতের উপর দিয়ে জড়ানো উপবীতটি দেখা যাচ্ছে, ঠিক তেমনি করে। পরের যুগে গ্রীকদের মত আলখাল্লাও পরতে সুরু করেছিলেন ভারতবাসীরা। উত্তরীয়ের মত ঢিলা-ঢালা ধাঁচের সঙ্গে এই আলখাল্লারও বেশ খানিকটা মিল আছে।

পাটলিপুত্রের জীবনযাত্রার কথা শুনলে। এবার শোন সেকালের রাজনৈতিক অবস্থার কথা। সুদূর পাঞ্জাব থেকে আর্য-শক্তির কেন্দ্র তখন সরে এসেছে বিহারে। পুরাকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের প্রতিপত্তিই ছিল সব চেয়ে বেশী। পুরাণ-কাহিনীতেও তার অনেক প্রমাণ আছে। তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সব চেয়ে বড় যে সাম্রাজ্যের কথা আমরা পাই, তার রাজধানী কিন্তু ছিল পূর্ব-ভারতে। আর সব চেয়ে বড় সম্রাট ছিলেন অশোক। অথচ তাঁর বিষয়ে কতটুকুই বা লেখা আছে আমাদের ইতিহাসে।

তোমাদের অনেকেরই হয়তো ছেলেবেলা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বয়সের তোলা ফোটো আছে। আবার কেউ কেউ

হয়তো স্কুল-জীবন থেকে ডায়েরি রাখা শুরু করেছ। ডায়েরি বা দৈনিক রাখার অভ্যাসটা কিন্তু মন্দ নয়। পুরাকালের কোন বড় লোকও এ-সবের ধার ধারতেন না। তাঁদের না ছিল ফোটো, না ছিল ডায়েরি। এমন কি সমসাময়িক লোকেরা যে এদের সম্বন্ধে দু'কথা লিখে রাখবেন, তাও রাখেন নি। তোমাদের মত যদি সেকালের ছেলে মেয়েদের বড় বড় লোকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করার নেশা থাকতো, তা হলেও আমরা অন্ততঃ কিছু বিখ্যাত লোকের নাম জানতে পারতাম। এ-সব ব্যাপারে সেকালের লোকেরা ছিলেন বেজায় উদাসীন। আর এমনি করে তাঁরা যেন ইতিহাসকেও ফাঁকি দিয়েছেন। কোথাও কোন স্বাক্ষর রেখে যাননি তার পাতায়। কত অপরূপ কারুকার্যময় মন্দির আছে ভারতবর্ষে, কিন্তু সেগুলি কাদের তৈরি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা আমরা জানতে পারিনি। কোথাও নামের চিহ্ন মাত্র রেখে যাননি তাঁরা। কত বিখ্যাত গ্রন্থের লেখকদের নামও এই কারণে আমাদের কাছে অজানা থেকে গেল। কোথাও বা আভাসে ইঙ্গিতে লেখকের নাম যদি বা পাওয়া গেছে, কিন্তু তাঁর পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় নি। রাজ-রাজড়াদের বেলাতেও সেই একই ব্যাপার। অনেক রকম নেশা তাঁদের ছিল, ছিল না কেবল এই নামের নেশা।

ভাল বা মন্দ কোন রাজাই ঢাক পিটিয়ে নিজের নাম প্রচার করেন নি।

এই যেখানে অবস্থা সেখানে অশোকের ছেলেবেলার ইতিহাস যদি কিছু না-ই পাওয়া যায়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সামান্য ছিঁটেফোটা যা পাওয়া গেছে এবারে সেইটুকু তোমাদের বলি।

অশোকের বাবা ছিলেন রাজা বিন্দুসার। কিন্তু তাঁর মা'র নাম যে কি তা বলা ভারি শক্ত। তখনকার দিনে রাজায় রাজায় সন্ধির একটি বড় মজার সর্ত ছিল। যিনি হেরে যেতেন তাঁর মেয়ে বা বোনকে বিয়ে দিয়ে দিতে হ'ত বিজয়ী রাজা বা রাজপুত্রের সঙ্গে। কেউ কেউ বলেন এই প্রথা অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের হাতে পরাজিত হয়ে গ্রীক বীর সেলুকস বিন্দুসারের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেন। এ-ছাড়া রাজাদের বহুবিবাহেরও প্রথা ছিল। রাজা বিন্দুসারও বহু বিবাহ করেছিলেন। তাঁর রাণীদের মধ্যে একজন ছিলেন চম্পা দেশের একটি ব্রাহ্মণ কন্যা! অপরূপ রূপসী ছিলেন তিনি। অন্যান্য রাণীরা তাঁকে সেজন্য ভয়ানক ঈর্ষা করতেন। এমন কি তাঁরা সবাই একজোট হয়ে রাজার কাছে থেকে তাঁকে দূরে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন।

কিন্তু সৌন্দর্যকে কি কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে? না যা ভাল তাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারে কেউ? চম্পা দেশের মেয়ের রূপ গুণের কাছেও ক্রমে ক্রমে সকল রাণীকেই হার মানতে হ'ল। শেষ পর্যন্ত রাজার পাটরাণী হলেন এই চম্পার মেয়ে। ইনিই নাকি ছিলেন অশোকের মা। অশোক ছাড়া আর একটি ছেলে ছিল তাঁর। সে অশোকেরও বড়। তা-ছাড়া অন্য রাণীদেরও অনেক ছেলে-মেয়ে ছিল।

রাজপুত্র অশোক যেমন ছিলেন চতুর, তেমনি ছিলেন সাহসী। না-হ'লে তক্ষশীলার মত প্রদেশে বিন্দুসার তাঁকে রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করে পাঠাতেন না। এই প্রদেশ শাসন করা রীতিমত কঠিন ব্যাপার ছিল। কিছুকাল আগে তক্ষশীলার লোকেরা রাজা বিন্দুসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সে বিদ্রোহ অবশ্য বিন্দুসারই দমন করেছিলেন। তবু এই-রকমের গোলমেলে প্রদেশের ভার যে অশোকের উপর দেওয়া হয়েছিল, তাঁর যোগ্যতার সেটাও একটা বড় প্রমাণ বৈকি। তা-ছাড়া উজ্জয়িনীর শাসন ভারও ছিল অশোকের উপর।

অশোক যখন উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা তখন বিদিশার এক বণিকের কন্যাকে দেখে তাঁর রূপে তিনি মুগ্ধ হন। এই

মেয়েটিকেই অশোক বিয়ে করেন। শোনা যায়, মেয়েটির নাম ছিল দেবী। তিনি শুধু রূপে দেবী নন, গুণেও ছিলেন দেবী। ইনি জন্মেছিলেন সাঁচিতে। সাঁচিতে যে অপরূপ স্তুপটি অশোক নির্মাণ করেছিলেন, সে-টি নাকি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন এই দেবীরই নামে।



বিদিশার কন্যা—দেবী

মৃত ব্যক্তিদের স্মরণ করার উদ্দেশ্যেই স্তুপ নির্মিত হত। স্তুপগুলি দেখতে ছিল অর্দ্ধ-গোলাকার, ছোটখাটো পাহাড়ের

টিলার মত। তার চারিদিকে থাকতো কারুকার্যকরা সুন্দর রেলিং। এই রেলিংগুলি তৈরি হ'ত পাথর কেটে কেটে, আর তার গায়ে খোদাই করা থাকতো বহুবিধ মূর্তি। সাঁচির এই বিরাট স্তুপ আমাদের শিল্পের ইতিহাসে আজও অমর হয়ে আছে। দিল্লী আর বম্বের মধ্যে যদি কখনও তোমরা যাতায়াত করো তবে এই স্তুপটি তোমাদের পথেই পড়বে। তখন এটি দেখে নিতে ভুলো না যেন।



রামগ্রাম স্তুপ (মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট মিউজিয়ম পত্রিকা)

বিন্দুসার যখন মৃত্যু শয্যায় অশোক তখন ছিলেন উজ্জয়িনীতে। সংবাদ পেয়েই তিনি রাজধানীতে এলেন।

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে রাজা না হয়ে রাজা হলেন অশোক। কেমন করে তা সম্ভব হ'ল, তার সঠিক বিবরণ জানা যায় না। তবে তোমরা তার কারণ কিছুটা হয়তো অনুমান করে নিতে পারবে। হয়তো অন্যান্য রাজপুত্রদের চেয়ে তাঁর রাজা হবার যোগ্যতা বেশী ছিল।

শোনা যায় রাজা বিন্দুসারের নাকি ইচ্ছা ছিল যে তাঁর মৃত্যুর পরে রাজপুত্র সুসীম রাজা হন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রীদের ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে অশোক রাজা হলেই রাজ্য বেশী নিরাপদ হবে। এই কাহিনীর মূলে অনেকখানি সত্য আছে।

সিংহাসনের অধিকার নিয়ে কিছুটা রক্তপাত যে ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে অশোক তাঁর সকল ভাইকে হত্যা করেছিলেন এ-কাহিনী অতিরঞ্জিত। তাঁর অনুশাসনগুলি পড়লে তোমরা দেখতে পাবে যে কিসে তাঁর ভাই বোনদের ভাল হবে সে-কথা অশোক খুবই ভাবতেন। অথচ তাঁর ভাই এবং আত্মীয়-স্বজনেরা কিন্তু খুব সহজ লোক ছিলেন না। অশোক রাজা হবার পর প্রথম প্রথম তাঁরা নানা ভাবে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। তিনি যে সহজে রাজা হতে পেরেছিলেন তা-ও মনে হয় না। তা যদি হতেন, তবে

বিন্দুসারের মৃত্যু আর অশোকের অভিষেকের মধ্যে দীর্ঘ চার বছরের তফাৎ থাকতো না।

অশোকের সিংহাসন লাভ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। এর অর্থ যে কি তোমরা যার যেমন খুসি আঁচ করে নিও। এখন গল্পটি শোন ঃ

অশোকের চেহারা ছিল রীতিমত কাঠখোট্টা। তাই বিন্দুসার তাঁকে মোটেই দেখতে পারতেন না। একদিন তাঁর ইচ্ছা হল যে রাজপুত্রদের পরীক্ষা নেবেন। সন্ন্যাসী পিঙ্গল বৎসজীবকে ডেকে তিনি বললেন, 'প্রভু, আপনি রাজপুত্রদের পরীক্ষা করে বলুন, আমার মৃত্যুর পরে রাজা হবার সব চেয়ে কে বেশী যোগ্য।'

পিঙ্গলবৎসজীব বললেন, "মহারাজ, আপনার পুত্রদের মন্দার ফুলের বাগানে নিয়ে চলুন। সেইখানে তাদের পরীক্ষা করা যাবে।" সন্ন্যাসীর কথামত রাজা রাজপুত্রদের নিয়ে গেলেন মন্দার বাগে। অশোককে কিন্তু তিনি সঙ্গে নিলেন না। এদিকে অশোকের মা তাঁকে ডেকে বললেন, "মহারাজ রাজকুমারদের নিয়ে মন্দার বাগে গেছেন। সেখানে তাদের পরীক্ষা হবে। তাই তোমারও সেখানে যাওয়া দরকার।"

অশোক জবাব দিলেন, "আমার সেখানে গিয়ে কী বা লাভ? মহারাজ ত আমার উপর মোটেই খুসি নন। তিনি

আমার দিকে ফিরেও চাইবেন না।" রাণী বললেন, "তবু তোমার যাওয়া উচিত।" মায়ের কথার অবাধ্য হলেন না অশোক। বললেন, "বেশ, যাব। তবে তার আগে তুমি আমার জন্য সেখানে কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও।"

অশোক তাঁর পিতার রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে রওয়ানা হলেন মন্দার ফুলের বাগানে। যেতে যেতে তিনি পথে দেখতে পেলেন একটি বুড়ো হাতি। এক সময় রাজা বিন্দুসার চড়তেন এই হাতিটিতে। সেই হাতিতে চেপে অশোক গেলেন মন্দার বাগে। সেখানে গিয়ে অন্যান্য রাজপুত্রদের মত দামী আসনে না বসে তিনি বসলেন মাটির উপর। তারপর খাওয়া-দাওয়া সুরু হ'ল। অশোকের মা তাঁর জন্য একটি মাটির পাত্রে কিছু ভাত আর দই পাঠিয়েছিলেন। অশোক তাই খেলেন।

পিঙ্গল বৎসজীব রাজপুত্রদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন, "এদের মধ্যে অশোকই হবে রাজা। কিন্তু রাজা বিন্দুসার তাকে মোটেই পছন্দ করেন না। আমি যদি অশোকের রাজা হবার কথা বলি, তবে হয়তো আমার নিজের প্রাণ বাঁচানই শক্ত হবে।"

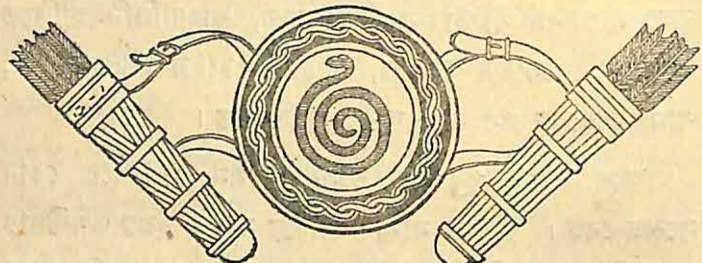
তাই কে রাজা হ'বে সে-কথা স্পষ্ট করে তিনি বললেন না। শুধু আভাসে কথাটা জানিয়ে দিলেন রাজাকে।

বললেন, "আজকে যে সব চেয়ে ভাল বাহনে এসেছে, সব চেয়ে ভাল আসনে বসেছে, সব চেয়ে ভাল পাত্রে আহার করেছে, সব চেয়ে ভাল পানীয় পান করেছে এবং সব চেয়ে ভাল খাদ্য খেয়েছে, সে-ই রাজা হবার যোগ্য।" অশোক মনে মনে বুঝলেন যে সন্ন্যাসী তাঁর কথাই বলছেন, কারণ তিনি হাতিতে এসেছেন, বসেছেন মাটিতে, আহার করছেন মাটির পাত্রে, পান করেছেন জল আর খেয়েছেন দৈ-ভাত।

অশোক যে খুব শক্তিশালী ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নিজের নানা অশান্তির মধ্যেও দুরন্ত তক্ষশীলার নূতন বিদ্রোহ তিনি অনায়াসে দমন করেন। রাজ্যাভিষেকের আট বছর পরে জয় করেন কলিঙ্গ দেশ। এই ভয়াবহ যুদ্ধ-জয়ের কথা অশোক নিজেই তাঁর একটি শিলালিপিতে লিখে রেখে গেছেন। সেই যুদ্ধের ফলে যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা গিয়েছিল এক লক্ষ লোক। যুদ্ধের ফলে দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখা দিল দেশে। তাতেও অনেক লোক প্রাণ হারালো। দেশ অধিকার করার পর এক লক্ষেরও অধিক লোক পাঠানো হ'ল নির্ব্বাসনে। এত সাংঘাতিক সে-সব ঘটনা যে চিন্তা করলেও শিউরে উঠতে হয়।

অশোক দিন-রাত ভাবতে লাগলেন এ-সব কথা। অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। অনুশোচনায় তাঁর মন ভরে উঠলো।

কোষবদ্ধ তরবারি তিনি সরিয়ে রাখলেন এক পাশে। জীবনে আর কোনদিন তিনি তা স্পর্শ করেন নি। চিরকালের জন্য মন স্থির করে ফেললেন তিনি। দিগ্‌বিজয় যদি করতেই হয় তার অন্য পথ আছে। যুদ্ধ ছাড়াও দিগ্‌বিজয় করা চলে।

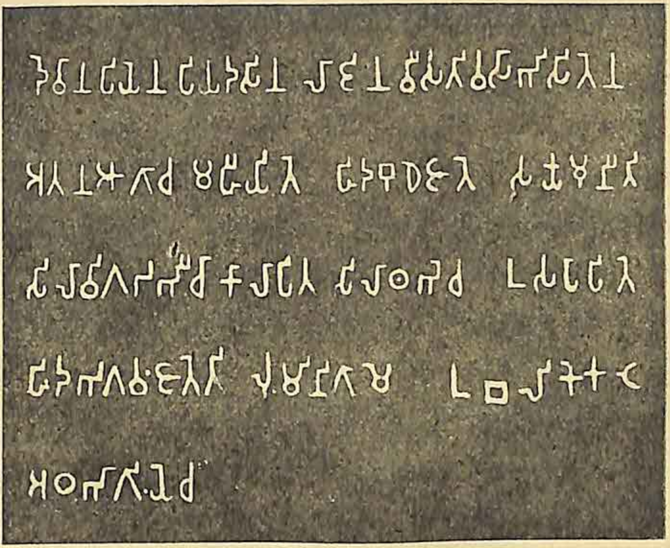


আর যুদ্ধ নয়

অবশ্য যুদ্ধের যে একেবারেই কোন ভাল দিক নেই, তা নয়। মানুষের সাহস এবং বীরত্বের পরিচয় যুদ্ধক্ষেত্রেও পাওয়া যায় প্রচুর। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ আহতদের সেবা-শুশ্রূষাও করে কম নয়। কিন্তু যুদ্ধের মন্দ-ফলের তুলনায় তা নিতান্তই তুচ্ছ। তাই যুদ্ধ যাতে ঘটতে না পারে সেই ব্যবস্থাই আমাদের করা উচিত। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়াও মানুষের সেবা করার অনেক ক্ষেত্র আছে।

অনুশোচনার যে আগুন তাঁর মনে জ্বলতে থাক্‌লো সেই আলোতে অশোক দেখতে পেলেন নূতন পথ। কলিঙ্গের যুদ্ধ

তাঁর জীবনের প্রথম এবং শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি নূতন পথে সুরু করলেন নূতন অভিযান। এবারে তাঁর লক্ষ্য হ'ল দেশ-জয় নয়, মানুষের মন জয়। মানুষের প্রাণ ক্ষয় করার চেয়ে তার মন জয় করা অনেক বড় কাজ। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? মানুষেকে ভালবেসে, প্রেম দিয়ে এই



সম্রাট অশোকের এক শিলালিপি প্রথম লাইনের প্রথম অংশে রয়েছে "দেবানপিয়েন পিয়দশিনা লাজিনা"

অসাধ্য সাধন করবেন স্থির করলেন তিনি। তিনি এর নাম দিলেন 'ধর্মবিজয়'। অশোক সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এই প্রেমের সাধনায়। দূর-দূরান্তে প্রসারিত হ'ল তাঁর এই ধর্ম-বিজয়ের বাহু। পাহাড় আর স্তম্ভের গায়ে গায়ে বহু অনুশাসন খোদাই করে অশোক লিখে রেখে গেছেন এই ধর্মবিজয়ের কাহিনী।

অনুশাসন মানে হ'ল রাজার আদেশ। পাহাড় আর স্তম্ভের গায়ে অশোক খোদাই করে রেখে গেছেন তাঁর কথা। এই ভাবে তিনি চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন তাঁর বাণী। কাগজে-কলমে লিখে রাখলে তা চিরকাল না-ও থাকতে পারে। কালির লেখা মুছে যেতে পারে, কাগজও হারিয়ে যেতে পারে, নষ্ট হতে পারে। কিন্তু শিলালিপি আর স্তম্ভলিপি কোন কালেই ধ্বংস হবে না। অশোক জানতেন যে তাঁর যা কথা তা শুধু ভাল কথা নয়, স্থায়ী সত্য কথা। তাই স্থায়ী পাহাড়ের বুকে সে-কথা তিনি খোদাই করে রেখে গেছেন, যাতে তারা হারিয়ে না যায়; যে-পর্যন্ত চন্দ্র-সূর্য থাকবে সে-পর্যন্ত মানুষকে যাতে তারা পথ দেখাতে পারে।

সে অনুশাসন গুলি আজও তেমনি আছে। তার মধ্য একটি যেন বিশেষ করে তোমাদের মত ছোট ছেলেমেয়েদের

জন্যেই লেখা। মহীশূরে একটি পাহাড়ের গায়ে আছে এই শিলালিপিটি:

"সম্রাট বলেছেন :— মাতাপিতার আজ্ঞা পালন করবে। সকল প্রাণীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে! সত্য কথা বলবে। এগুলি কর্মেরই অঙ্গ, তাই এ-সব পালন করা উচিত। সেইরূপ ছাত্রের উচিত শিক্ষককে সম্মান করা, আত্মীয়-সজনদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা। এই হ'ল ধর্মের প্রাচীন আদর্শ। এই পথই হল দীর্ঘজীবন লাভের পথ। তাই মানুষের উচিত এই আদর্শ মেনে চলা।"

আজকের দিনেও এই সুন্দর সদাচার গুলির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি, বরং প্রয়োজন বেড়ে উঠেছে। ছোটদের কর্তব্যের কথা যেমন এতে বলা হয়েছে, বড়দের দায়িত্বের কথাও সে-যুগে তেমনি জানা ছিল। মা-বাবা ছেলেদের ভালবাসতেন এবং মঙ্গল চিন্তা করতেন বলেই ছেলেরা তাঁদের মান্য করতো। শিক্ষকেরা পিতার মত ছাত্রদের ভালবাসতেন বলেই তাঁরা ছাত্রদের শ্রদ্ধা পেতেন। শ্রদ্ধা করা আর শ্রদ্ধা পাওয়ার মধ্যে যে একটি গভীর যোগাযোগ আছে, সে-কথা তাঁরা জানতেন।

এবার অশোকের আর একটি শিলালিপির কথা তোমাদের

বলি। এটি হ'ল তাঁর তের নম্বর শিলালিপি। কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ ফলাফল দেখে কি ভাবে অশোকের মন বৌদ্ধ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হ'ল সেই কথা লেখা আছে এই শিলালিপিতে। তাছাড়া আরও অনেক কথা আছে। এই শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে অশোকের সাম্রাজ্য সিরিয়ার সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিরিয়ার রাজা ছিলেন তখন আন্টিওকাস। বিদেশী রাজাদের সঙ্গে অশোকের খুবই মিত্রতা ছিল তিনি তাঁদের জানিয়েছিলেন যে দেশের আভ্যন্তরীণ নীতির মতই তাঁর বৈদেশিক নীতিও হ'ল শান্তি প্রতিষ্ঠা। তিনি যেখানে যা-কিছু বলেছেন তা মানুষকে ভালবেসেই বলেছেন। তাই তাঁর বাণী শুধু প্রজার কাছে রাজার উপদেশ নয়, মানুষের কাছে একজন মানব-প্রেমিকের আবেদন। তাঁর সদাচারের উপদেশ যে দেশে বিদেশে সকলেরই ভাল লেগেছিল এবং তাঁরা যে তা যথাসাধ্য মেনে চলতেন, এ-কথাও অশোক জানতেন, আর জেনে তৃপ্তি বোধ করতেন।

এই সব থেকে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে যিশু খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিনশো বছর পূর্বেই শান্তি এদেশে রাজধর্মের অঙ্গ ছিল। তখন ভারতে এমন একজন রাজা ছিলেন যিনি শান্তির বাণী প্রচার করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ

করাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। সেকালে অশোকের মত অত বিপুল সৈন্যবাহিনী আর কারও ছিল না। কিন্তু সে সৈন্যবাহিনীকে আর কখনও তিনি যুদ্ধে নিযুক্ত করেননি। তার কোন প্রয়োজনও ঘটেনি। অশোকের কালের সঙ্গে এ-কালের কী প্রভেদ! বিপুল সৈন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও অশোক যুদ্ধের ইঙ্গিত পর্যন্ত করেন নি। আর আজ বৃহত্তর শক্তিগুলি অবিশ্রান্ত শান্তির কথা বলছেন সত্য, অথচ সেই সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন এবং আশঙ্কাও দিনদিনই বাড়িয়ে চলেছেন।

সে যা-ই হোক, কলিঙ্গ জয় করে অশোক বৃহত্তম ভারত সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেন। তাঁর সময় পৃথিবীতে এত বড় সাম্রাজ্য আর কোথাও ছিল না। উত্তরে হিমালয় থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত ছিল এর সীমা। কেবল মাত্র কুর্গ এবং সাগরের তীরবর্তী তামিল দেশগুলি বাদ ছিল। রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে ছিল ব্রহ্মপুত্র। উত্তর এবং পূর্ব বাংলাও ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের ভিতরে। বাইরে ছিল শুধু আসামের কামরূপ অঞ্চল। উত্তর-পশ্চিমে গ্রীকরাজা দ্বিতীয় আন্টিওকাসের রাজত্ব সিরিয়া ছিল শেষ সীমা। পশ্চিম আফগানিস্থানের দক্ষিণ অঞ্চল এবং বেলুচিস্থানের প্রায় সমস্তটাই ছিল

অশোকের অধীনে। উত্তরে নেপাল এবং কাশ্মীরও ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে অশোকের সাম্রাজ্য মাদ্রাজ থেকে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বলা যায় অশোকের সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গিয়ে ঠেকেছিল প্রায় সেই খানে যেখানে প্রথম বৈদিক রাজা মনু প্রথম রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।


দক্ষিণা মূর্তি শিব (কাবেরিপক্কম স্থাপত্য)

কাশ্মীরের শ্রীনগর সহর অশোকেরই তৈরী এখানে তিনি কয়েকটি শিব মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্রে কৃষ্ণ ও শিবকে বলা হয় গুরু। মনে রেখ যে শিব যে সব তত্বকথা শিক্ষা দিয়ে ছিলেন তাঁর সঙ্গে বুদ্ধের

উপদেশের অনেক মিল আছে। এখানে শিবের যে ছবিটি ছাপা হয়েছে তাতে তিনি উপদেশ দানের ভঙ্গিতে উপবিষ্ট ; তাঁর পায়ের কাছে দুইটি হরিণ। এরা যেন মৃগদাবে বুদ্ধের প্রথম উপদেশ দানের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

হিন্দুর দেব-সমাজে সকল মতের দেবতার দ্বারই ছিল অবারিত। ভাগবতে এই বিষয়ে শ্রীহনুমানজীর একটি সুন্দর উক্তি আছে। তিনি বলেছেন "আমি জানি যে হরি আর রামের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। দু'জনকেই আমি প্রণাম করি। কিন্তু তবু আমার মন-প্রাণ আমি পদ্ম-আঁখি শ্রীরামের চরণেই অর্পণ করেছি।"

কথা হল যে তুমি যদি তোমার নিজের দেবতাকে সত্য সত্যই ভালবাস তবে অন্যের দেবতাকেও শ্রদ্ধা না করে তুমি পারবে না। কিন্তু যদি তুমি কেবল মাত্র তোমার দেবতাকে বড় করতে চাও, তবে তোমার মন চাইবে অন্যের দেবতাকে ছোট করতে। এটা ভক্তি-র কথা নয়, আড়া-আড়ির কথা।

শুধু দেবতা কেন, অন্য ব্যাপারেও এই একই জিনিস ঘটে। তোমাদের স্কুল বড় এই নিয়ে অন্য স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে তোমরাও কি ঝগড়া করোনি ? হয় তো মারামারিও করেছ। তোমাদের স্কুল বড় এই জিদ চেপে গেছে বলেই তোমরা

মারামারি করতে পেরেছ ; না হ'লে পারতে না। কিন্তু এই জিদের মূল্য কতটুকু! নিজের যা কিছু আছে ছোট ছেলেমেয়েরা তো তা-ই সবচেয়ে ভাল বলে বিশ্বাস করে। এটা অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। মন যাঁদের পরিণত তাঁরা জানেন যে ভাল জিনিস কারও একচেটিয়া নয়। সে জিনিস তাঁদেরও যেমন থা ক তে পারে, অন্যেরও তেমনি থাকতে পারে।


রাম-সীতা (প্রাচীন স্থাপত্য অনুকরণে)

সম্রাট অশোক নিজেকে 'পিয়দসি লাজা' ব'লে উল্লেখ করেছেন। 'পিয়দসি' কথার সহজ মানে হ'ল 'দেখতে সুন্দর'। ঠিক এই অর্থে মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামের রূপ বর্ণনা 'প্রিয়দর্শন' এই সংস্কৃত শব্দটি ব্যবহার

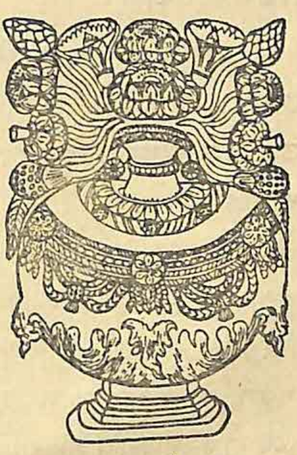
করেছেন। কিন্তু অশোক 'পিয়দসি' শব্দটি এই অর্থ ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় না। প্রথমতঃ নিজে সুন্দর নয় বলেই জানতেন তিনি। তাছাড়া,'আমি সুন্দর'এ-কথা কি কোন রাজার গর্বের বিষয়? তাই মনে হয় 'পিয়দসি লাজা' মানে 'প্রিয়দর্শন রাজা' নয়। এর মানে হল, যে রাজা সকলকে প্রিয় দেখেন, ভাবেন, অথবা সকলে যে রাজাকে প্রিয় দৃষ্টিতে দেখে; কিসে সকলের ভাল হবে সব সময় এই যাঁর চিন্তা। এই অর্থে ধরলে অশোকের নামের সঙ্গে ভারী সুন্দর মানিয়ে যায় কথাটা। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে **সর্বপ্রথম** "কল্যাণ রাষ্ট্র" গঠন করেছিলেন অশোক। তাছাড়া অশোকের চরিত্রে যে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছিল এই 'পিয়দসি' কথাটি যেন তারই সাক্ষী। যৌবনের সেই নিষ্ঠুর রাজা আর তিনি নন, সকলের মঙ্গল চিন্তায় এখন তিনি বিভোর। কলিঙ্গ যুদ্ধে তিনি মনে মনে যে আঘাত পেয়েছিলেন তারই ফলে তাঁর জীবনে এসেছিল এই নাটকীয় পরিবর্তন। যাকে সবাই ভয় করতো তিনি হয়ে উঠলেন সকলেরই প্রিয়।

পৃথিবীতে যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা সবাই নিজ নিজ দেশের ইতিহাসের দান। দেশের ইতিহাস না জানলে সেই দেশের বড় লোকদের জীবনী ঠিক বোঝা যায় না। আবার ইতিহাসকে পুরোপুরি জানতে হলেও বড়লোকদের জীবন-কথা

ভাল ভাবে জানা দরকার। অশোকের সম্পর্কেও এই সাধারণ নীতি খাটে। সকলের মঙ্গল করার যে বিরাট প্রচেষ্টা অশোক করেছিলেন তার মূল রয়েছে আমাদের দেশেরই ইতিহাসে। বেদের একটি কথা শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। বেদ বলেছেন, "রাজ্য মানেই হ'ল দেশের লোক।" শুনলে মনে হয় কথাটা একেবারে একালের কথা। আবার রাজার কাজ কি সে-কথা বলতে গিয়ে বেদ বলেছেন, "রাজার কাজ হ'ল গরীবদের কিসে ধনলাভ হয় তার ব্যবস্থা করা।" দরিদ্রদের শোষণ করা তাঁর কাজ নয়, যা কিছু ভাল সকলের সঙ্গে ভাগ করে তা তিনি উপভোগ করেন। বর্তমানে যাকে বলা হয় "কল্যাণরাষ্ট্র", সংস্কৃত 'গণশ্রী' কথাটির অর্থও তাই। 'গণ' মানে হ'ল 'লোক'; আর 'শ্রী' মানে হল 'উত্তম জীবন'। 'শ্রী' বলতে কেবল ধন-দৌলত বোঝায় না। সম্পদ এবং সৌন্দর্য এই দু'টি অর্থই একত্রে রয়েছে "শ্রী" শব্দের মধ্যে। গান্ধীজির 'সর্বোদয়' কথাটির-সঙ্গেও এই কথার ভাবের মিল আছে—গণ অর্থাৎ সর্বজনের শ্রী অর্থাৎ সৌভাগ্য বা উন্নতি।

এখানে যে ছবিটি দেখছো এটি অমরাবতীতে পাওয়া একটি বৌদ্ধ পাত্র। এই পাত্রটি মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের প্রতীক। পাত্রটি শুধু পদ্ম ফুলে ভর্তি নয়, ফুল আর ফুলের কুঁড়ি উপচে

পড়েছে এর চতুর্দিকে। এ যেন বলতে চায় যে মানুষের জীবনের পূর্ণতা শুধু জিনিষের প্রাচুর্যে নয়, তার সঙ্গে চাই স্বভাবের মাধুর্য। পদ্মফুল বিশেষতঃ মঙ্গল, সম্পদ আর সৌন্দর্যের দেবী লক্ষ্মীর আসন। সাধারণতঃ বুদ্ধ মূর্তির পায়ের কাছেও দেখতে পাবে একটি পদ্ম ফুল। আমাদের কাব্যও এই শতদল পদ্মফুলের প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ। এর পাপড়িগুলির মধ্যে মিলনের একটি অপূর্ব ছন্দ আছে। মানুষ যদি এই ভাবে শতেক পার্থক্য নিয়েও একটি সুবিন্যস্ত সমাজ-জীবন গড়ে তুলতে পারে, তবেই গড়ে উঠবে তার কল্যাণ-রাষ্ট্র। নূতন সূর্যের স্পর্শে যখন পদ্ম ফুল ফুটে ওঠে, সে যেন মানুষের কাছে নিয়ে আসে নূতন করে আর একবার জন্মলাভের আনন্দ, নিয়ে আসে স্বাধীনতার নূতন এক সম্ভাবনা, সার্থকতার নূতন এক ভবিষ্যৎ।



অমরাবতীর বৌদ্ধ শিল্প

আর একটি শিলালিপিতে অশোক কি লিখেছেন শোন,

"মানুষের মঙ্গলের জন্য আমি কাজ করে যাব......সেইজন্তই আমি পাহাড়ের গায়ে লিখে রাখলাম ধর্মের উপদেশ। এরা অক্ষয় হয়ে থাকবে। আর এই উপদেশ অনুসারে আমার পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রেরা মানুষের মঙ্গলের জন্য অক্লান্ত ভাবে কাজ করে চলবে। 'সর্বলোক হিতম্'—সকল লোকের হিত করবে তারা।"

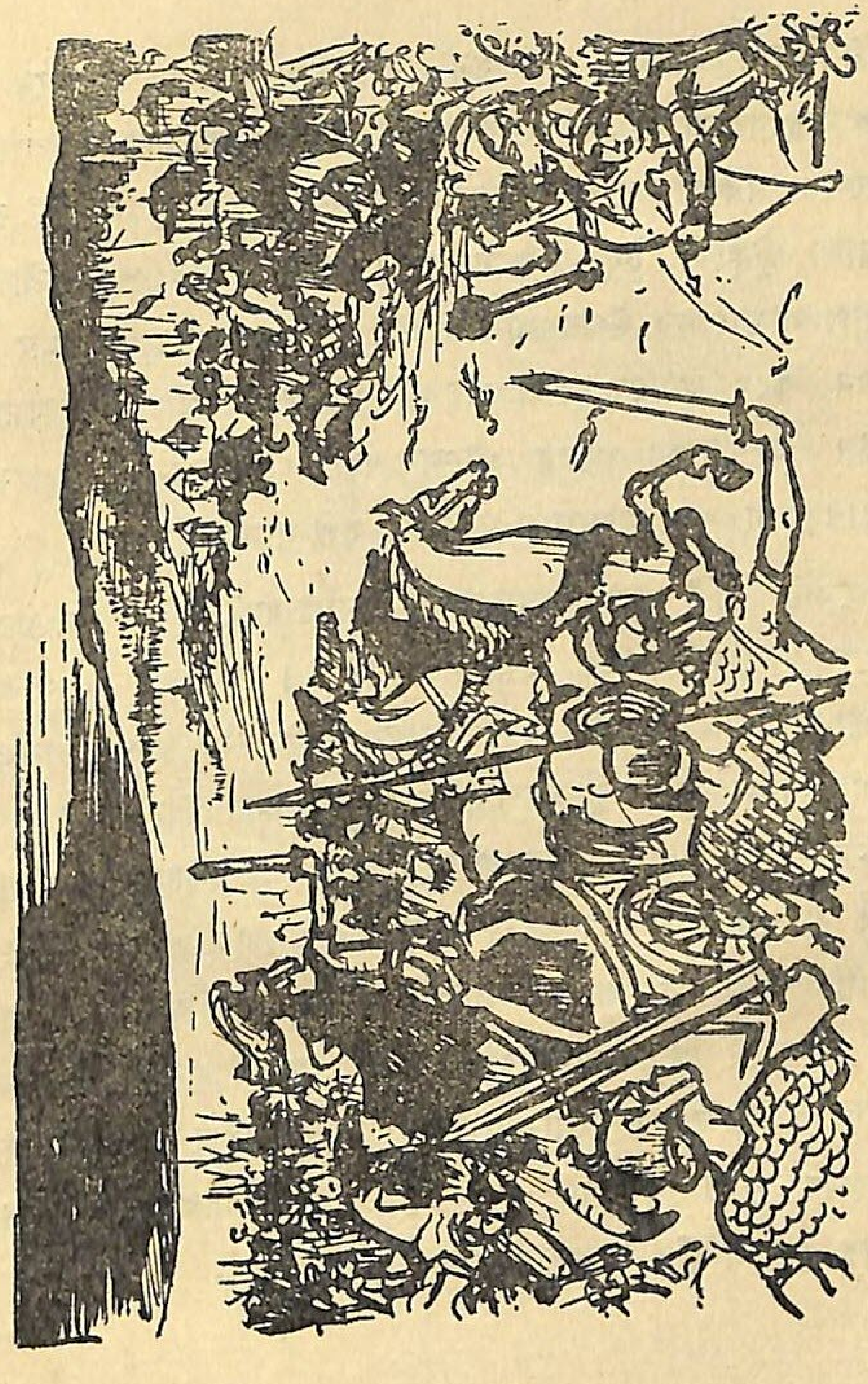
এমনি ভাবে অশোক নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন মানুষের সেবায়। মনে মনে তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর প্রজামঙ্গল ব্রত বংশানুক্রমে পালিত হবে। এমনি ছিল তাঁর আন্তরিকতা। কলিঙ্গের লোকদের তিনি এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে মগধের লোকের মত তারাও তাঁর আপন জন। আজকাল তোমরা একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের কথা শুনতে পাও। কিন্তু অশোক তাঁর সাম্রাজ্যের সকল লোককেই সমান চোখে দেখতেন। একটি প্রস্তর-স্তম্ভে এই রাজ-ঘোষণা তিনি খোদাই করিয়েছিলেন "সবাই আমার সন্তান"। প্রজাদের সন্তানের মত দেখা তিনি রাজার কর্তব্য বলে মনে করতেন। শুধু কর্তব্য নয়, তাঁর মতে এই হ'ল প্রকৃত রাজ-ধর্ম। সংস্কৃতে প্রজা শব্দের অর্থ সন্তান, তাই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে বলা হয় প্রজাপতি। এই ঘোষণায়

তিনি আরও বলেছেন: ''আমার আন্তরিক ইচ্ছা হ'ল এমন ভাবে প্রজাদের সেবা করা যাতে তাদের মঙ্গল হয় এবং তারা সুখে থাকে।" রাষ্ট্রের চোখে সকল প্রজাই যে সমান, সে সম্বন্ধে পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে মহান আর কোন রাজকীয় ঘোষণা নেই।

অশোক যেমন প্রজাদের নৈতিক জীবনের উন্নতির কথা ভাবতেন, তেমনি রাজ্য শাসনের দিকেও ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সাম্রাজ্যের সর্বত্র তাঁর প্রতিবেদক অর্থাৎ চর ছিল। তাদের কাজ ছিল প্রজাদের সকল সংবাদ রাজার কানে পৌঁছে দেওয়া। রাজার কাছে যে কোন সময়ে যাবার অধিকার ছিল তাদের। তিনি খেতেই বসুন, কিম্বা অন্দর মহলে থাকুন, গোশালায়, পাল্কীতে বা উপবনে যেখানেই থাকুন না কেন চরদের তাঁর কাছে যাবার ঢালা হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন অশোক। এ-ছাড়া তিনি ব্যক্তিগত দূতও নিযুক্ত করেছিলেন। এদের বলা হ'ত পুরুষ। এদের সাহায্যে রাজ্যের উচ্চ রাজপুরুষ রাজুকদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। রাজুকদের কাজ ছিল গ্রামের লোকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা, 'জনপদ হিত সুখায়ে'—জপদবাসীদের হিত এবং সুখ বিধান করা। মনে হয়, গ্রামগুলিতে তাঁরা রাজকর

আদায় এবং বিচার এই দুই কাজই করতেন। কারুর উপর যাতে কোন রকম অবিচার না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হ'ত তাঁদের। নগর শাসনের ভার ছিল 'নগর ব্যবহারক'-দের উপর। এ-ছাড়া ছিলেন মহামাত্রেরা। তাঁরা দেখতেন রাজ্যের সকল রকম ভাল-মন্দ। মাঝে মাঝে এক সঙ্গে বসে পরামর্শ করতেন তাঁরা। এ-বিষয়ে রাজার নির্দেশ ছিল, "যদি মহামাত্রদের সভায় কোন বিতর্ক উপস্থিত হয়, অথবা যে সকল ঘোষণা বা দান সম্বন্ধে আমি মৌখিক আদেশ দিয়েছি তার যদি কোন পরিবর্তন তাঁরা করতে চান, অথবা যদি কোন গুরুতর সমস্যা দেখা দেয় তবে আমি যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, অবিলম্বে সে-কথা যেন আমাকে জানান হয়।"

সম্রাট অশোক দিন-রাত সকল সময়ই প্রায় ডুবে থাকতেন কাজের মধ্যে। প্রজাদের মঙ্গল চিন্তায় বিশ্রামের পর্যন্ত সময় পেতেন না তিনি। ধর্ম আর রাষ্ট্র দু'এর কথাই তিনি সমান ভাবে চিন্তা করতেন। একটির জন্য অপরটিকে কখনও তিনি অবহেলা করেন নি। তা-ছাড়া ধর্ম এবং রাষ্ট্র এক হয়ে মিশে গিয়েছিল তাঁর মনে। ধর্মের সেবা মানেই ছিল রাষ্ট্রের সেবা। আর রাষ্ট্রের কল্যাণই ছিল তাঁর কাছে ধর্ম।



পশ্চিম এশিয়ার ব্যাক্ট্রীয়ান গ্রীকগণের ভারত আক্রমণ

তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধর্ম মানুষকে শান্তিকামী করে। আর মানুষের মনের শান্তি কামনাই রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে তোলে। কিন্তু এতো পরিশ্রম সত্ত্বেও অশোকের পরে তাঁর সাম্রাজ্য টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের উপর ঘনিয়ে এল দুর্যোগের কালো মেঘ। কেমন করে কি যে হ'ল তার সঠিক ইতিহাস আমাদের জানা নেই। অশোকের পরের পাঁচশ বছরের ইতিহাস অন্ধকারে ঢাকা। তারপরে অভ্যুত্থান ঘটলো গুপ্ত-সামাজ্যের।

কেউ কেউ বলেন ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ-ধর্মকে ধ্বংস করার সুযোগ খুঁজছিলেন। হয়তো বা তাই। যদিও অশোক ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁদের প্রতি তাঁর উদারতারও অভাব ছিল না, তবু অশোকের শক্রতা করা তাঁদের পক্ষে বিচিত্র নয়। কারণ মানুষতো আর সব সময় বিচার বিবেচনা করে শক্রতা করে না। এ-কথা দুঃখের হ'লেও সত্য। এ-ও শোনা যায় যে পশ্চিম এশিয়ার ইউরোপীয় শাসনকর্তারা মুখ বুজে যে অশোকের শান্তির বাণী শুনছিলেন তা এমনি নয়। তলায় তলায় তাঁদের একটা মতলব ছিল। ভারতবর্ষ আক্রমণ করে কাবুল এবং সিন্ধু উপত্যকা আবার অধিকার করার সুযোগ খুঁজছিলেন তাঁরা।

এইচ, জি ওয়েলসের "আউটলাইন অব হিষ্ট্রি" নামে একখানা বই আছে। কলেজে পড়ার সময় এই বই তোমরা পড়বে। এই বইয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন জাতির ইতিহাস আসলে মানব জাতিরই ইতিহাস। অশোক সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : "ইতিহাসে তিনিই একমাত্র সম্রাট যিনি যুদ্ধে জয়লাভ করেও তারপর আর কোন দিন যুদ্ধ করেননি।"

অশোক এমন কিছু স্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন যার জন্য আজও পৃথিবীর লোক তাঁকে স্মরণ করে। ওয়েলস বলছেন : "পৃথিবীর ইতিহাসে হাজার হাজার সম্রাটের নাম আছে। তাঁদের উপাধিই বা কত! কেউ মহামান্য, কেউ মহিমার্ণব, কেউ মহামহিমান্বিত; কেউবা আর কত কি! তাঁদের মধ্যে অশোকের নাম আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। অন্ধকার আকাশে একটি মাত্র তারার মত তিনি শোভা পাচ্ছেন। ভল্গা থেকে জাপান পর্যন্ত আজও লোকে তাঁর নামে মাথা নোয়ায়। চীন তিব্বত, এমন কি তাঁর ধর্মমত পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ আজও তাঁর মহিমার ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। আজও যত লোক অশোককে মনে করে রেখেছে, তত লোক কোন কালে কন্‌স্টান্‌টাইন্‌ বা শার্লম্যানের নামও শোনেনি।"

তাই, যদিও অশোক তার সাম্রাজ্য স্থায়ী করে যেতে

পারেননি, তবু যা তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন তার মূল্য সমস্ত পৃথিবী স্বীকার করে নিয়েছে। সাম্রাজ্য তো একটা বিশেষ জাতির সম্পত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। যতই তার পরমায়ু হোক, তা কখনও চিরকাল থাকতে পারে না! যে জিনিসে সকল মানুষের সমান অধিকার, আর যা অক্ষয় হয়ে থাকবে, একমাত্র তা-ই আমাদের আত্মাকে শান্তি দিতে পারে। পৃথিবীকে অশোক দিয়ে গেছেন তেমনি এক সম্পদ যাতে সকল লোকের ভাগ, যা থাকবে চিরকাল।

অন্য রাজারা যা কখনও কল্পনাও করতে পারেননি, অশোক তাই করেছিলেন। এমন একটি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি যার মূল কথা হ'ল যুদ্ধ না করা, মানুষের উপর কোন অন্যায় অবিচার না করা। আবার শোন ওয়েলস কি বলেছেন: "সকলের জীবনের উদ্দেশ্য এবং পথ যাতে এক হয়, মানুষকে সেই শিক্ষাই তিনি দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর পূর্বে পৃথিবীতে আর কোন সম্রাট এ-চেষ্টা করেন নি। তাঁর অনুশাসন-গুলিতে মানুষকে তিনি এমন ভাবে জীবনযাপন করতে শিখিয়েছিলেন যা শুধু কারো একার পক্ষে নয়, সকলের পক্ষেই মঙ্গল জনক।"

উইল ডুরাণ্ট এই অনুশাসন গুলি সম্বন্ধে বলেছেন যে

রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এ-গুলি অতুলনীয়। অশোকের নীতি এবং কীর্তি কত যে অসাধারণ সে কথা বলতে গিয়ে আমেরিকার এই চিন্তানায়ক একটি বড় সুন্দর কথা বলেছেন: "এ যেন কোনও নব্য য়ুরোপীয় সাম্রাজ্য ঘোষণা করে বসলেন যে এরপর থেকে রাজ্যের রাজনীতি হবে খৃষ্টনীতি।" এই 'যেন' শব্দটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মত। খৃষ্ট যুগের কোন আধুনিক সাম্রাজ্যের পক্ষে এ-কথা ঘোষণা করা যে প্রায় অসম্ভব, তারই ইঙ্গিত রয়েছে এই ছোট্ট কথাটির মধ্যে।

নবীন ভারতবর্ষও গ্রহণ করেছে এই অহিংস নীতি। তার বৈদেশিক নীতি শুধু যুদ্ধ-বিরোধী নয়, যুদ্ধ-চিন্তারও বিরোধী। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি পৃথিবীতে আবার যুদ্ধ বাধে তবে ভারতবর্ষকেও প্রস্তুত থাকতে হবে তার জন্য। কারণ আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি পরস্পরের এত কাছাকাছি এসে পড়েছে যে যুদ্ধ বাধলে কারো পক্ষেই সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব নয়। তবুও ভারতবর্ষ আপ্রাণ চেষ্টা করবে এই যুদ্ধ-বিরোধী নীতি মেনে চলতে। একালে অশোকের আদর্শ মেনে চলা সেকালের মত সহজ না হলেও, ভারতবর্ষ সহজে এই মহান আদর্শ পরিত্যাগ করবে না।

রাজা হিসাবে অশোক কেমন ছিলেন এ-কথা যদি তোমরা

আমাকে জিজ্ঞাসা করো, তবে আমি ডুরাণ্ট যা বলেছেন সেই কথাই তোমাদের বলবো ঃ "রাজনৈতিক অর্থে অশোক কৃতকার্য হ'তে পারেন নি। কিন্তু আর এক অর্থে ইতিহাসে একটি বিরাট কাজ তিনি করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর ছ'শ বছরের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম সমগ্র ভারতে প্রসার লাভ করে। এশিয়াতেও সুরু হয় তার রক্তপাতহীন বিজয় অভিযান। সুদূর অতীতে একজন স্বপ্ন-বিলাসী সাধক ভারতবর্ষের সিংহাসনে আসীন ছিলেন, অনেকটা তারই ফলে আজও সিংহলের কাণ্ডি থেকে জাপানের কামাকারু পর্যন্ত গৌতমের প্রশান্ত মূর্তি মানুষকে বলছে, শান্তিকামী হও, পরস্পরকে ভালবাস।"



শান্তির চিন্তায় মগ্ন গৌতম বুদ্ধ
(চীনা শিল্পির অনুকরণে)

ভিক্ষু অশোক

যৌবনে অশোক ছিলেন ভয়ানক নিষ্ঠুর। গল্প আছে, তাঁর অবাধ্য হওয়ায় পাঁচ-পাঁচশ মন্ত্রীর মাথাই কেটে ফেলেছিলেন তিনি। আর একবার তিনি প্রাসাদের কয়েকটি যুবতীকে জীয়ন্তে পুড়িয়ে মেরেছিলেন। শোনা যায়, তাদের সংখ্যাও নাকি ছিল পাঁচ-শ। তবে গল্প-কথায় সাধারণতঃ বেশ গালভরা সংখ্যাই বলা হয়ে থাকে। এঁদের অপরাধ কি ছিল জান? খেলার ছলে রাজার উপবনের কিছু ডালপালা ভেঙ্গেছিলেন তাঁরা, আর কিছু ফুল ছিঁড়েছিলেন, এই মাত্র।

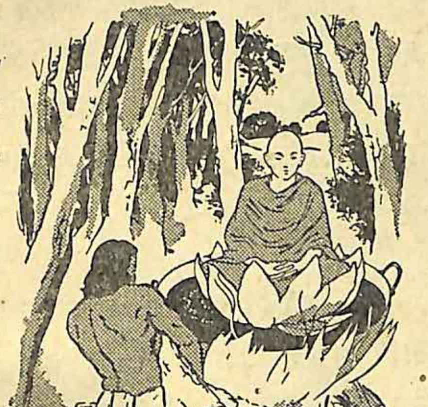
এ-যে নিতান্তই বাড়াবাড়ি সে-কথা মহামাত্য রাধাগুপ্ত রাজাকে অনেক করে বোঝালেন। বললেন, রাজার পক্ষে নিজের হাতে কাউকে হত্যা করা উচিত নয়, একেবারে ঘোর অন্যায়। অশোক মেনে নিলেন সে কথা। কিন্তু তাতে তাঁর হত্যা-লীলা বন্ধ হ'ল না। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তিনি নিযুক্ত করলেন একজন জল্লাদ। নৃশংসতায় সে-ও কিছু কম ছিল না। হত্যায় তার ছিল প্রচণ্ড উল্লাস! দু'টি সর্তে সে এই কাজ করতে রাজি হল। প্রথম সর্ত হল, এমন একটি

কারাগৃহ তার চাই, যার ফটকটী হবে সৌন্দর্যে অনুপম। দ্বিতীয় সর্ত সাংঘাতিক—সেই ফটকের ভিতর একবার যে পা দেবে তার আর নিস্তার নেই। তাকে প্রাণ দিতে হবে চণ্ড-গিরিকের হাতে। চণ্ড-গিরিক ঐ জল্লাদেরই নাম। চণ্ড মানে নিষ্ঠুর; আর গিরির পাদদেশে সে থাকতো বলে তাকে বলা হত গিরিক। বন্দীদের নানা ভাবে যন্ত্রণা দেওয়াই ছিল তার পরম আনন্দ। সেই সুরম্য কারাগারে আর একটি নরক সৃষ্টি করে তুলেছিল চণ্ড-গিরিক।

একদিন পাটলীপুত্রে এলেন এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। ভিক্ষা করা ভিক্ষুর ধর্মের অঙ্গ। বৌদ্ধ ভিক্ষুও বেরুলেন ভিক্ষা করতে। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে দাঁড়ালেন সেই অপরূপ কারাগার-ফটকের সামনে। কে ভাবতে পারে যে এত সুন্দর ফটক কারাগারের? ভিক্ষুও ভুল করলেন। তিনি ফটকের ভিতরে পা বাড়ালেন ভিক্ষার আশায়। আর সঙ্গে সঙ্গে চণ্ড-গিরিক তাঁকে বন্দী করলো। বৌদ্ধ ভিক্ষু বলে অবশ্য একটু অনুগ্রহ তাঁকে করলো চণ্ড-গিরিক। তাঁকে সাত দিন সময় দিল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'তে। সপ্তম রাত্রি প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গে সে এসে ভিক্ষুকে বললো, 'ভিক্ষু রাত্রি শেষ হয়েছে। ঐ দেখ সূর্য উঠছে। আজ তোমার মৃত্যুর দিন।' সে-কথা শুনে ভিক্ষু

হাসলেন। উত্তর দিলেন, 'রাত্রি সত্যই প্রভাত হয়েছে। আমার মনের অন্ধকারও কেটে গেছে। সূর্য উঠেছে, সে আলোর ছোঁয়া লেগে আমার আত্মা জেগে উঠেছে। আমি প্রস্তুত।'

বিরাট এক অগ্নি-কুণ্ড প্রজ্বলিত করলো চণ্ড-গিরিক। তার উপরে চাপিয়ে দিল রক্ত আর তেলে ভর্তি প্রকাণ্ড একটি কড়াই। আর তার মধ্যে ফেলে দিল সেই ভিক্ষুকে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! কড়াইয়ের নীচে কাঠের স্তূপ পুড়ে ছাই হ'ল কিন্তু আগুনের একটুও আঁচ লাগলো না ভিক্ষুর গায়ে। আরও কাঠ আনা হল' কিন্তু তাতে আবার আগুনই ধরলো না। চণ্ড দেখলো সেই



পদ্মাসনে ভিক্ষু

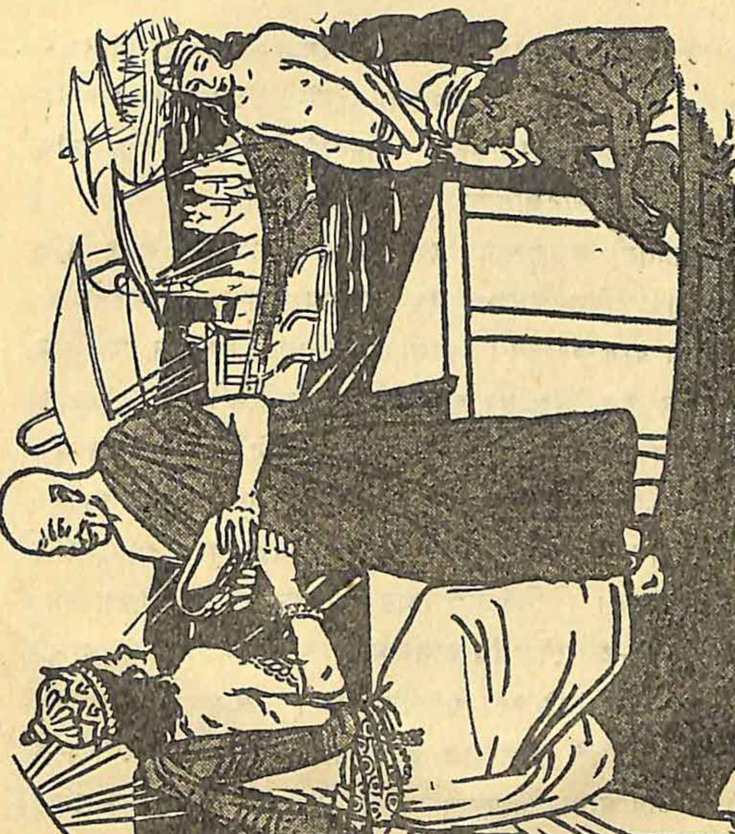
তপ্ত কড়াইএর মধ্যে প্রশান্ত মনে একটি বিকশিত পদ্মের উপর পদ্মাসনে বসে রয়েছেন ভিক্ষু।

দেখে চমকে উঠলো চণ্ড। ভয় পেয়ে খবর পাঠালো রাজার কাছে। খবর পেয়ে রাজা এলেন ছুটে। নিজের চোখে দেখলেন সেই বিস্ময়কর দৃশ্য। তারপরে জোড়হাতে শিষ্যের মত বিনয়াবনত হয়ে তিনি বন্দনা করলেন ভিক্ষুকে।

ভিক্ষু বললেন, "মহারাজ, বুদ্ধ তথাগত ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে অশোক নামে পাটলীপুত্রের এক রাজা সারা পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন। তিনি স্থাপন করবেন বুদ্ধের অসংখ্য স্মারক-চৈত্য, আর প্রচার করবেন চুরাশি হাজার ধর্মানুশাসন।"

ভিক্ষুর কথা শুনে রাজা ঘোষণা করলেন, রাজহংসের পাখার মত উজ্জ্বল, আর চাঁদের মত সুন্দর অসংখ্য চৈত্য-বিহারে পৃথিবী ছেয়ে দেবেন তিনি। তারপর তিনি ভক্তিভরে উচ্চারণ করলেন শরণাগতির মহামন্ত্র, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

সুরম্য সেই কারাগার ভূমিসাৎ করা হ'ল। অশোক দীক্ষা নিলেন বৌদ্ধধর্মে। অবশ্য এ-কাহিনীর কোন উল্লেখ সম্রাট নিজে কোথাও করেন নি। কলিঙ্গ অনুশাসনে নিজের সম্বন্ধে যে কথা তিনি বলেছেন, তা তোমাদের পূর্বেই বলেছি।



অশোক কর্তৃক সন্ন্যাসী উপগুপ্তকে সংবর্ধনা

সে যা-ই হোক, অশোকের মনে যে একটা বিরাট পরিবর্তন এল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাণে তাঁর বাসনা জাগলো তীর্থ পর্যটনের। সন্ন্যাসী উপগুপ্তের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র তীর্থগুলিতে ঘুরে বেড়ালেন তিনি।

সন্ন্যাসী উপগুপ্তের সঙ্গে অশোকের সাক্ষাতের কাহিনীটিও অপূর্ব। স্থবির উপগুপ্ত তখন উরুমাণ্ড পাহাড়ের নটভাটিকা বিহারে বাস করছেন। রাজা তাঁর মন্ত্রীদের বললেন যে তিনি নিজে যাবেন উপগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। হাতি, ঘোড়া আর রথ প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন তিনি। মন্ত্রীরা কিন্তু অন্য পরামর্শ দিলেন। বললেন, রাজা নিজে কেন যাবেন সেখানে; বরং কোন দূত পাঠিয়ে উপগুপ্তকে নিমন্ত্রণ করে আনা হোক রাজধানীতে। তিনিই রাজসভায় এসে রাজাকে ধর্মোপদেশ দিন। অশোক এ-প্রস্তাবে রাজি হলেন না। বললেন, 'না, না, সে কী কথা। তিনি কষ্ট করে অসবেন কেন। আমারই তো তাঁর কাছে যাওয়া উচিত।' রাজা দূত পাঠালেন স্থবিরের কাছে,তাঁকে রাজসভায় আসার অনুরোধ জানিয়ে নয়, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থণা করে। স্থাবির ভাবলেন রাজধানী ছেড়ে রাজার আসা অনেক ঝক্‌মারী ও প্রজাদের অনেক খরচান্ত; তাই তিনি উত্তরে জানালেন, 'আমি নিজেই যাব রাজারসঙ্গে দেখা করতে'।

আটহাজার শিষ্য নিয়ে যেদিন তিনি রাজধানীতে পদার্পণ করলেন সেদিন উৎসবে মেতে উঠলো পটলীপুত্র নগর। রাজপথগুলি পতাকায় সাজান হ'ল ; পুষ্প আর মাল্য-চন্দন ভূষিত হ'ল নদীতীর থেকে রাজপ্রসাদ। গন্ধ বারির ধারা বর্ষণে স্নুরভিত হ'ল দশ দিক। মঙ্গলবাদ্যের অবিরাম ধ্বনি সৃষ্টি করলো সুরের মায়ালোক। আনন্দ-মুখর জনতার সারি অতিক্রম করে নগ্ন পদে ভক্ত সম্রাট ছুটে গেলেন নদীর তীরে উপগুপ্তকে অভ্যর্থনা করতে। মাটিতে এক-পা আর নৌকায় এক-পা রেখে সম্রাট পরম যত্নে স্থবির উপগুপ্তকে ধরে নামালেন; তারপর নতজানু হয়ে ভক্তি-পুলকিত চিত্তে অশোক জড়িয়ে ধরলেন স্থবিরের দুখানা হাত। স্থবির উপগুপ্ত আশীর্বাদ করলেন রাজাকে।

অশোক তখন নিবেদন করলেন, 'স্থবির, ভাগবতের আদেশ আমি যথাসাধ্য প্রতিপালন করে আস্‌ছি। পাহাড়ের চুড়ার মত সুন্দর, বহুমূল্য প্রস্তর-খনির স্তূপে আমি পৃথিবী ছেয়ে দিয়েছি। কারুকার্যময় দণ্ডে আর ছত্রে সজ্জিত করে তাদের অপরূপ করে তুলেছি। ভাগবতের স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষা করেছি অসংখ্য আধারে। আমার যা কিছু আছে—পত্নী, পুত্র, ধন, রত্ন আর নিজেকে পর্যন্ত আমি সমর্পণ করেছি তথাগতের পাদপদ্মে।'

রাজাকে নিয়ে উপগুপ্ত তীর্থ-পরিক্রমায় বেরুলেন। নিয়ে গেলেন তাঁকে বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যানে। সেখানে বুদ্ধের মাতা রাণী মহামায়ার অতি-প্রিয় অশোক বৃক্ষটিও দেখালেন। দর্শণ করালেন কপিলাবস্তু, আর সেই পূণ্য স্থান যেখানে সর্বপ্রথম রাজা শুদ্ধোধন বুদ্ধকে দেখেছিলন। শাক্য বংশের গৃহদেবতাকেও দর্শণ করলেন অশোক। উপগুপ্তের কাছে শুনলেন গৃহদেবতার সেই অপূর্ব কাহিনী। বুদ্ধকে যখন গৃহদেবতার কাছে আনা হ'ল আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য, তখন আশীর্বাদের পরিবর্তে দেবতাই নাকি প্রণাম করেছিলেন শিশু বুদ্ধকে। যে কক্ষে মহাপ্রাজাপতি বুদ্ধকে লালন-পালন করেছিলেন, যেখানে বুদ্ধ লেখাপড়া আর অস্ত্র-চালনা শিখেছিলেন তথাগতের শৈশবের সেই লীলাভূমি দর্শণ করে কৃতার্থ হলেন অশোক। তারপরে স্থবির তাঁকে নিয়ে গেলেন সেই স্থানে যেখানে বুদ্ধ সর্বপ্রথম বার্দ্ধক্য, ব্যাধি আর মৃত্যুর রূপ দেখেছিলেন—আর দেখেছিলেন সেই সন্ন্যাসীকে যিনি তাঁকে বুঝিয়েছিলেন এই মায়াময় পৃথিবীর স্বরূপ। অশোক দেখলেন সেই তোরণ-দ্বার যে পথে নিশীথ রাত্রে একাকী বুদ্ধদেব প্রাসাদ পরিত্যাগ করে যাত্রা করেছিলেন সেই পথের সন্ধানে, যে পথে মানুষের দুঃখের অবসান হবে।



পৃথিবীতে বুদ্ধদেবেরর অবতরণ—স্বর্গে উৎসব
কপিরাইট—ইণ্ডিয়াগবর্ণমেণ্ট

এইভাবে অসংখ্য বৌদ্ধ তীর্থ ভ্রমণ করলেন অশোক—বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী থেকে, তাঁর নির্বাণ-স্থান কুশীনগর পর্যন্ত। প্রতিটি স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক লক্ষ করে স্বর্ণ মুদ্রা দান করলেন তিনি। লুম্বিনী গ্রামকে তিনি সর্বপ্রকার রাজকর থেকে মুক্ত করে দিলেন। যে বোধিদ্রুমের তলে গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, সেই বৃক্ষ চোখের মনির থেকেও প্রিয় হয়ে উঠলো অশোকের। কিংবদন্তী আছে, অগণিত সোনা আর মণি মাণিক্যে তিনি ঢেকে দিয়েছিলেন সেই বৃক্ষটিকে। বোধিদ্রুমের উপর রাজার এই অনুরাগ দেখে হিংসায় ভরে উঠলো রাণী তিষ্যরক্ষিতার মন। তিনি তাঁর সহচরীকে আদেশ দিলেন, মন্ত্রের বলে বৃক্ষটিকে ধ্বংস করতে। মন্ত্রের গুণে বৃক্ষটি শুকিয়ে যেতে লাগলো। সেই সঙ্গে কিন্তু রাজাও হয়ে পড়লেন খুব অসুস্থ। রাজার অবস্থা দেখে রাণী ভয় পেয়ে গেলেন শেষে। সহচারীকে অনুনয় করলেন পাল্টা মন্ত্রে বৃক্ষটিকে বাঁচিয়ে তুলতে। অতি ধীরে বৃক্ষটি আবার বেঁচে উঠ্‌লো, ক্রমে রাজাও ঐসঙ্গে সুস্থ হ'তে লাগলেন।

কেবলমাত্র তীর্থ স্থান দর্শন করেই ক্ষান্ত হলেন না অশোক। রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে তিনি গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে



অশোকের গ্রাম-সেবা

লাগলেন। স্বচক্ষে দেখতে লাগলেন প্রজাদের অবস্থা। প্রজাদের তিনি মনে করতেন নিজের সন্তানের মত। তাই তারা কেমন আছে, সৎপথে চলছে কিনা, তা নিজের চোখে না দেখে তিনি স্বস্তি পেতেন না। প্রয়োজন হলে তিনি তাদের পরামর্শ দিতেন, সাহায্য করতেন আপদে বিপদে। পিতার মত তিনি তাদের উপদেশ দিতেন। প্রশ্ন করে করে জেনে নিতেন তাদের মনের কথা। মঙ্গলের পথে তাদের চালনা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কি ভাল, কি মন্দ, কি সৎ এবং কি অসৎ, কিভাবে তারা পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলেমিশে সদ্ভাবে থাকতে পারে এসব শিক্ষা তাদের তিনি দিতেন। তাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা আলোচনা করে তিনি দেখিয়ে দিতেন কি ভাল আর কি মন্দ। শিক্ষা দিতেন জগতের সকলের কিসে মঙ্গল হয়—কারণ তিনি জানতেন যা সকলের পক্ষে মঙ্গলকর নয়, কারুরই তাতে শেষ অবধি মঙ্গল হ'তে পারে না।

কিন্তু অশোকের রাজ্য ছিল বহু বিস্তৃত। সেকালে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে সময়ও লাগতো প্রচুর। তাই যতটা ইচ্ছা ততটা ভ্রমণ করতে পারতেন না অশোক। তাছাড়া রাজকার্য ছিল। তাতে অবহেলা করাও সঙ্গত নয়। তাই তিনি একদল লোক নিযুক্ত করলেন প্রজাদের ঘরে ঘরে

তাঁর বাণী পৌঁছে দেবার জন্য। রাজকর আদায়কারী 'রাজুক' দের উপরও তিনি এই ভার দিলেন।

'প্রাদেশিক' এবং 'যুক্তক'-দের কাজ ছিল জনে জনে ধর্ম উপদেশ দেওয়া। তাঁরা শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন। জোর করে কাউকে সে উপদেশ পালন করতে বাধ্য করতেন না। রাজার আদেশ ছিল জোর করে কাউকে দিয়ে যেন ভাল কাজও না করানো হয়। নিজের ইচ্ছায়, সাগ্রহে মানুষ ধর্ম পথে চলবে এই ছিল তাঁর মনের ইচ্ছা। তাই তিনি চেয়েছিলেন মানুষের অন্তরে ভালমন্দের বোধ জাগাতে। তিনি খুলে দিতে চেয়েছিলেন তাদের মনের চোখ! ধনরত্ন দানের মত তিনি তাদের 'দৃষ্টিদান' করতেও চেষ্টার ত্রুটী করেন নি।

এই রাজ কর্মচারীরা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রাজ্য পরিদর্শনে বেরুতেন। তাঁরা দেখতেন প্রজারা কি ভাবে, কতটুকু নীতি মেনে চলছে। শিলালিপি কোথায় কোথায় খোদাই করা হবে তার স্থান নির্বাচনের ভারও ছিল তাঁদের উপর। যে-সব স্থানে শিলালিপি খোদাই করার উপযুক্ত পাহাড় পাওয়া যেত না, সেখানে স্থাপন করা হ'ত শিলা-স্তম্ভ। আর তার গায়ে খোদাই করা হ'ত অশোকের কল্যাণ-বাণী। শান্তি ও সদাচারের এই বাণীগুলিকে তাই বলা হয় 'শিলা

উপদেশ'। সহজ কথ্য ভাষায় এগুলি লেখা, যাতে এর অর্থ বুঝতে কারো কোন কষ্ট না হয়। এই অনুশাসনগুলি ছড়িয়ে আছে দূর দূরান্তরে, ভারতের সর্বত্র। দিল্লী, মহীশূর, পেশোয়ার, এলাহাবাদ, গুজরাট আর উড়িষ্যা—কোথায় নেই এই শিলালিপি? অশোকের রাজ্য যে কতদূর বিস্তৃত ছিল এই শিলালিপিগুলির অবস্থান থেকেও তা অনুমান করা যায়।

কিন্তু রাজ কর্মচারীরা যদি নীতি প্রচার নিয়েই মত্ত থাকেন তবে রাজকার্যের অবহেলা ঘটতে পারে। প্রজাদের ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও তো তাঁদের নজর রাখতে হবে? তাই কেবলমাত্র নীতি প্রচারের জন্য ধর্ম্ম-মহামাত্র নামে নূতন কতগুলি পদের সৃষ্টি করলেন অশোক। এঁরা থাকতেন বড় বড় সহরে। শুধু গৃহস্থদের মধ্যেই এঁরা ধর্ম প্রচার করতেন না—কারাগারে বন্দীদের মধ্যে এবং গৃহহীন শ্রমণদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করাও ছিল এঁদের কাজ।

শুধু কি দেশে? ভারতের বাইরেও দলে দলে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন অশোক। একদিকে যেমন তাঁরা বিদেশে রাজ-দরবারে অশোকের শান্তির বাণী বহন করে নিয়ে যেতেন, অন্যদিকে তেমনি প্রচার করতেন সেই মহান ধর্মের কথা—যে ধর্ম সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল মানুষের

ধর্ম। অশোক কেবলমাত্র নিজের সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন বিশ্বশান্তি। একদেশে অশান্তি ঘটলে অন্য দেশেও যে তার আগুন জ্বলে ওঠে, সে কথা অশোকের অজানা ছিল না।

সম্ভাষণের নানান রীতি আছে নানান দেশে। ইউরোপের লোকেরা বলে 'গুড্ মর্ণিং' 'গুড্ বাই'। আমরাও আজকাল এই সব শিখেছি। আমাদের দেশের খাঁটি সম্ভাষণের রীতি হ'ল—জয় গোপালজি, জয় রামজি, নমস্তে, সালাম আলেই-কুম, এই সব। বৌদ্ধেরা বলতেন, 'সবাই শান্তি লাভ করুক।' তা হলেই দেখ "এক বিশ্ব" আর "বিশ্ব শান্তি"র কথা ভারতবর্ষ কত যুগ যুগ আগে চিন্তা করেছে। মহাভারতের একটি সুন্দর শ্লোক আছে এই মর্মে। তোমরা সবাই সেটি মুখস্থ করে রেখ। শ্লোকটি হ'ল ঃ—

সর্ব্বে চ সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ॥

সবাই সুখী হোক, সবাই শান্তি পাক। সকলেই সুদিন দেখুক। কারো জীবনে যেন দুঃখ না আসে।

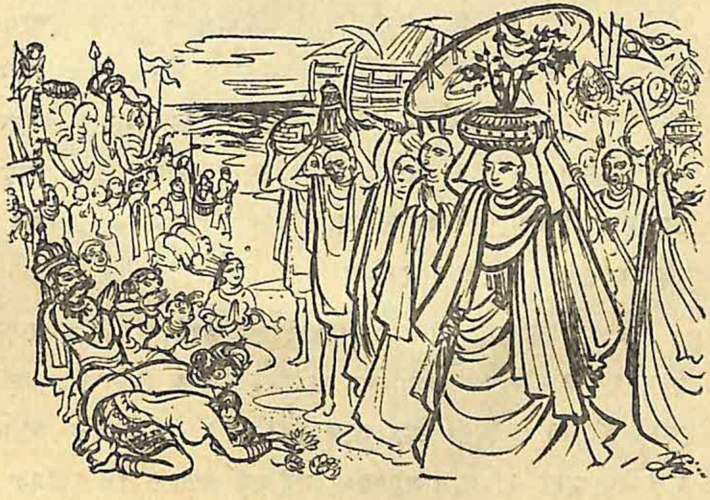
ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে বা পূজার বিধি-বিধান নিয়ে অশোক কখনও মাথা ঘামান নি। মানুষের মন থেকে কেমন

করে লোভ আর হিংসা দূর করা যায় এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। ভাল তত্ত্ব কথা বলার চেয়ে, ভাল মানুষ তৈরী করার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। তিনি জানতেন, যে উপদেশ মানুষ মেনে চলে না তার কোন মূল্য নেই। যা মনকে আকৃষ্ট করে না, মনের শান্তি তা থেকে কিছুই আসে না। একান্তভাবে অশোক ছিলেন কর্মবীর। তাঁর মতে, যে ধর্মে মানুষের জীবন আরও সুন্দর, আরও মধুর এবং আরও আনন্দময় না হয়, সে ধর্মে মানুষের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্বর্গ নিয়ে তর্কাতর্কি করে আর অসংখ্য প্রাণী হত্যা করে কিছুতেই ধর্মলাভ করা যায় না। এ বিষয়ে তিনি অক্ষরে অক্ষরে বুদ্ধদেবের আদেশ পালন করেছিলেন।

সারনাথের অদূরে মৃগদাবে বুদ্ধদেব তাঁর প্রথম উপদেশ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর পঞ্চ শিষ্যের কাছে। এই সারনাথে অশোক একটি সুন্দর স্তম্ভ স্থাপন করেন। তার চূড়ায় ছিল পিঠে-পিঠ-লাগানো চারটি সিংহমূর্ত্তি। এর ঠিক নীচেই ছিল ধর্ম্মচক্র। এখন কেউ কেউ বলছেন ধর্ম্মচক্র সিংহ মূর্ত্তির উপরে ছিল, পরে ভেঙে পড়ে' যায়, আর তখন নীচে জুড়ে দেওয়া হয়। হ'তেও পারে। ধর্মের বল দেহের বলের

উপরে। তা যাই হোক, এই প্রতীক চিহ্নের মধ্যে একাধারে আছে শক্তি, মহিমা, মঙ্গল আর অগ্রগতির নিশানা। সিংহ শক্তির প্রতীক, কিন্তু সে শক্তি দীপ্তি আর মাধুর্যে অনুপম। চক্র নির্দেশ করছে জীবনের গতি, যে গতির সঞ্চার হয় মঙ্গল কর্মে। আমাদের উচিত এই প্রতীকের মর্ম আমাদের কর্মজীবনে প্রকাশ করা।

যে মঙ্গলময় জীবনের কথা বুদ্ধ বলেছিলেন, সে জীবনাদর্শ অশোক প্রচার করলেন দেশ-বিদেশে। এশিয়া, আফ্রিকা



সিংহলে বুদ্ধ-বাণী প্রচার

আর য়ুরোপ এই তিন মহাদেশেই তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা উত্তর-পশ্চিম এশিয়ায় গ্রীস উপনিবেশ থেকে মাসিডন পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। পারস্য, সিরিয়া এবং ইজিপ্টও বাদ পড়েনি। সিংহল গিয়েছিলেন মহেন্দ্র আর সঙ্ঘমিত্রা—রাজার পুত্র আর কন্যা। কারো মতে মহেন্দ্র অশোকের ছেলে নন, ভাই। আবার কেউ বলেন, অশোকের কোন কন্যাই ছিল না। কিন্তু বুদ্ধ-বাণী যে তিনি সিংহলে সঞ্চারিত করেছিলেন তাতে দুই মত নেই।

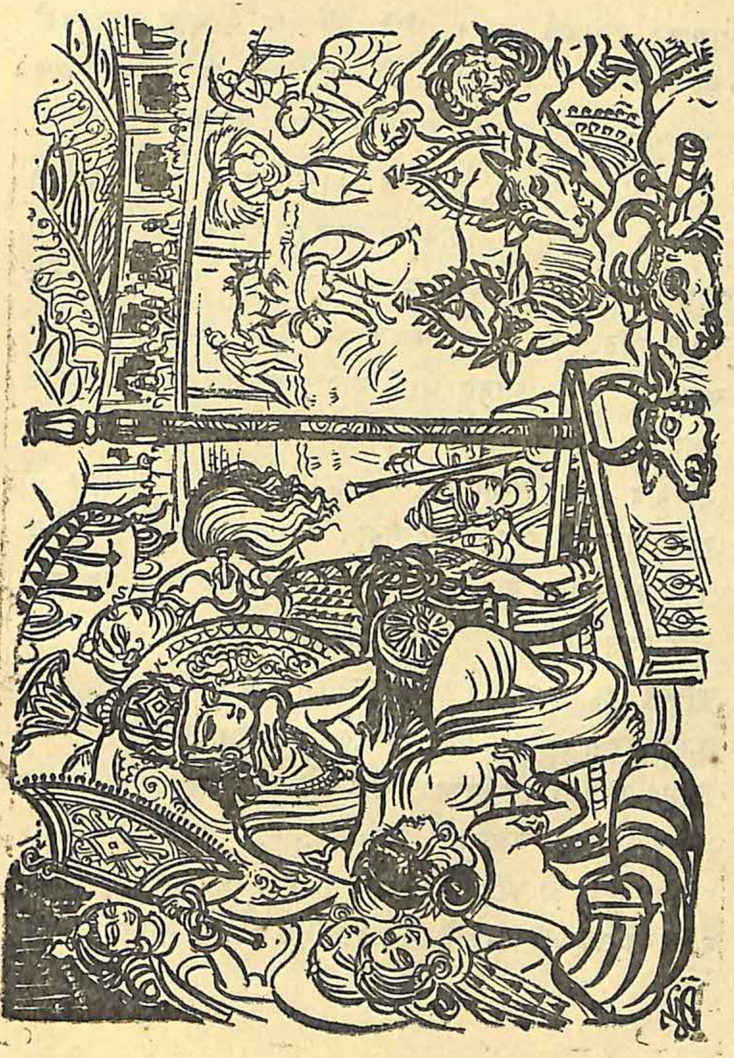
দেশ-বিদেশে এই ধর্মযাত্রার প্রেরণাও অশোক পেয়েছিলেন বুদ্ধেরই বাণী থেকে। তিন মাস সারনাথে অবস্থান করার পর বুদ্ধদেব একদিন তাঁর শিষ্যদের ডাকলেন। তখন তাঁর শিষ্যসংখ্যা মাত্র ষাট। তার মধ্যে তাঁর প্রিয় শিষ্য, তাঁর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের ভ্রমণ সহচর আনন্দও ছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁদের ডেকে বললেন ঃ

'এবারে তোমরা সর্বসাধারণের হিতের জন্য বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, দেব ও মানবের কল্যাণের জন্য চতুর্দিকে বেরিয়ে পড়। কোন দু'জনা তোমরা এক পথে যেও না। যে ধর্মের আদি, অন্ত এবং মধ্য মহিমায় সমুজ্জল সেই ধর্ম প্রচার কর তোমরা। সবাইকে সার্বঙ্গসুন্দর, ধর্মময় পবিত্র জীবনের সন্ধান দাও।"



অশোক আর মৃগয়ায় যান না

বুদ্ধের এই মহাব্রত উদ্‌যাপনের যথাশক্তি চেষ্টা করেছিলেন অশোক। ধর্মকে অশোক জীবনের সাধনা করে তুলেছিলেন। রাজ-রাজরাদের পক্ষে এ-এক নূতন সাধনা সন্দেহ নেই। তাঁর পূর্বে রাজারা আনন্দের উদ্দেশ্যে করতেন মৃগয়া আর বিহার যাত্রা, আর অশোক বার হলেন ধর্মযাত্রায়। 'ভেরী-ঘোষ' রূপান্তরিত হ'ল 'ধর্মঘোষে'। ভেরীঘোষ হ'ল দামামা বাদ্য, যুদ্ধের সঙ্কেত। কিন্তু অশোকের জীবনে আর যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল না, তাই সে ভেরী তিনি নিযুক্ত করলেন ধর্মঘোষণায়। যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজারা স্থাপন করতেন জয়স্তম্ভ, আর অশোক স্থাপন করলেন ধর্মস্তম্ভ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মানুষের নৈতিক জীবন সমৃদ্ধ হ'লে তবেই তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব। তাই মানুষকে ধর্মপ্রাণ করে তুলতে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। ধর্ম বলতে অশোক ঈশ্বরের আরাধনা বুঝতেন না, বুঝতেন মঙ্গলের অর্চনা। কাদের ঈশ্বর বড় এ-নিয়ে হানাহানিকে ধর্ম বলে না। ঈশ্বরে তাঁর ভক্তি যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ঈশ্বরকে নিয়ে কোথাও কথা কাটাকাটি করেননি তিনি। ঈশ্বরকে তিনি লাভ করেছিলেন সকল মানুষের মঙ্গল চিন্তার মধ্যে। মানুষ নিজে সুখী হোক এবং অন্য সবাইকে সুখী করুক, অশোকের মতে এই হ'ল



কৃষকের গুরু-শ্রমে ব্যথিত সিদ্ধার্থ

মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাঁর এই ধর্মে কোন অধিকারী ভেদ ছিল না। ছোট বড় সবাই এই সহজ ধর্ম পালন করে পুণ্য অর্জন করতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

অশোকের সময়ে বৈদিক ধর্ম যাগযজ্ঞবহুল এবং অন্তঃসার শূন্য হয়ে উঠেছিল। সাধারণের পক্ষে সে ধর্ম আচরণ করা ছিল প্রায় দুঃসাধ্য। ধনী ভিন্ন যজ্ঞের অত বলি কে আর সংগ্রহ করতে পারবে বল? গরীবদের অত টাকা কোথায় যে ধর্ম করবে? তাই তাদের স্বর্গে যাবার দরজাও প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। কিন্তু অশোক ধনী দরিদ্র সকলের জন্য যেন স্বর্গের সিংহদ্বার খুলে দিলেন। তিনি বললেন, অন্যকে যে দুঃখ না দেবে, সেই স্বর্গে যাবার অধিকারী। সে ধনী হোক বা দরিদ্র হোক তাতে কিছু যায় আসে না। গরীব এবং নিঃস্বদের জন্য অশোকের এই দরদ আমাদের রাজপুত্র সিদ্ধার্থের কথাই মনে করিয়ে দেয়। একবার রাজা শুদ্ধোধন রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক হল-কর্ষণ উৎসবে। ভেবেছিলেন ছেলে এই উৎসব দেখে আনন্দ পাবে। কিন্তু যা দেখলেন তাতে রাজপুত্রের মন ব্যথায় ভরে উঠলো। তিনি বললেন, "আহা, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কী কষ্টেই না কৃষকেরা দু'টি অন্ন সংগ্রহ করে!" মানুষের জন্য এই মমতাই সিদ্ধার্থকে বুদ্ধ করে তুলেছিল।

কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে ব্রাহ্মণদের প্রশংসা আছে। কিন্তু শেষের দিকে ব্রাহ্মণদের খুবই অধঃপতন ঘটেছিল। রাজ-রাজরাদের কাছে ধনরত্ন পাবার আশায় রীতিমত লুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। রাজা এবং বিত্তশালী লোকদের তাঁরা মন্ত্রণা দিতেন বড় বড় যজ্ঞ করার, কারণ এই সব যজ্ঞের দক্ষিণা বাবদ তাঁরা গরু, ঘোড়া, আর প্রচুর সোনারূপা পেতেন। তখন যজ্ঞ মানেই ছিল ব্রাহ্মণদের সুবর্ণ সুযোগ। লম্বা লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করতেন তাঁরা—বলির জন্য চাই এত ষাঁড়, এত বকনা বাছুর, এত গাভী, এত পাঁঠা আর এত ভেড়া। যূপকাষ্ঠের জন্য চাই এতগুলি গাছ। বরিষের জন্য এতগাছি কুশ তোল। রাজাদের চাকর-বাকর আর লোক লস্করদের তো এই সব হুকুম তামিল করতেই প্রাণান্তকর অবস্থা হ'ত।

ব্রাহ্মণদের এই সব নিয়মের অত্যাচারে ধর্ম তখন ধনীদের একচেটিয়া। আর গরীবদের তো ছিল খাটুনিই সার। অশোক সঙ্কল্প করলেন যে ধর্মকে তিনি গরীবদের আনন্দের ধন করে তুলবেন। ধর্ম কোন মানুষ, কোন জীবেরই ক্ষতির কারণ হবে না।

অশোক ধর্মের মোড় ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর সময় ব্রাহ্মণেরা তো ধর্মকে বেশ একটা জাঁকজমকের ব্যাপার করে

তুলেছিলেন। অশোক কিন্তু মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীর সেবাকেই ধর্ম করে তুললেন। তিনি নিজের জীবনও উৎসর্গ করলেন এই সেবাধর্মে। অবশ্য তাঁর সে সেবার আয়োজন বিপুল, প্রসার দেশব্যাপী। তাঁর রাণীরাও প্রজাদের মঙ্গলের জন্য বহু অর্থ দান করেছিলেন। রাজা অশোক রোগীর চিকিৎসার জন্য বহু হাসপাতাল স্থাপন করলেন। গৃহপালিত পশুর চিকিৎসারও ব্যবস্থা করলেন তিনি। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, মিশর ও সিরিয়ার মত বিদেশী মিত্র রাজ্যেও তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। প্রতি বছর বহু অপরাধীকে কারামুক্ত করে দিয়ে তাদের সৎ জীবন যাপন করার সুযোগ দিতেন তিনি। পথচারীদের সুবিধার জন্য শুধু প্রশস্ত রাজপথ তৈরি করেই তিনি ক্ষান্ত হ'ন নি, রৌদ্রতাপ নিবারণের জন্য তার দু'পাশে তিনি রোপণ করে-ছিলেন ছায়াতরু। আর পথের মাঝে মাঝে স্থাপিত করে দিয়েছিলেন বিশ্রামাগার, যাতে সেখানে দু-দণ্ড বিশ্রাম করে ক্লান্ত পথিকেরা শরীর জুড়িয়ে নিতে পারে। কোন কোন সহরে ভ্রাম্যমান শিক্ষকদের জন্য বাড়ী পর্যন্ত তৈরী করে দিয়েছিলেন তিনি!

পূর্বে রাজপ্রাসাদের রন্ধনাগারের জন্য প্রত্যহ বহু পশুপক্ষী

হত্যা করা হ'ত। অশোক অবশ্য একেবারেই তা বন্ধ করে দিলেন না। তিনি আদেশ দিলেন যে মাংসের জন্য দৈনিক মাত্র তিনটী প্রাণী হত্যা করা হবে—ছ'টি ময়ূর এবং একটি হরিণ। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও তিনি জানিয়ে দিলেন যে ক্রমে ক্রমে এ-ও বন্ধ করে দেওয়া হবে। চট্ করে মাংসের রসদ বন্ধ করে দিলে প্রাসাদের বাসিন্দাদের মনে পাছে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, এই জন্যই অশোক এই ব্যবস্থা করে-ছিলেন। তাছাড়া প্রাচীন কালে প্রাসাদবাসীদের অসন্তোষ রাজাদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠাও বিচিত্র ছিল না। আজকাল যেমন খাদ্য দ্রব্যের ঘাটতির সময় ভোজে অতিথি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়, তেমনি অশোকও উৎসবে নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বেশী হ'লে পশু হত্যাও বেশী হবে, এই ছিল তাঁর ভয়।



রান্নাঘরের এক যাত্রী

এই প্রাণীহত্যা বন্ধ করা ছাড়া অশোক কখনও কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের মত বা আচরণে হস্তক্ষেপ করেন নি। প্রতি সম্প্রদায়ের লোক যাতে নির্বিবাদে নিজ নিজ ধর্মাচরণ করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য তিনি কর্মচারী পর্যন্ত

নিযুক্ত করেছিলেন। কোন ধর্মমতেরই কণ্ঠরোধ করতে তিনি চান নি। বরং সকল সম্প্রদায়ই তাঁর কাছে আর্থিক অনুগ্রহ লাভ করেছেন। কোন ধর্ম সম্প্রদায়কে ছোট করা বা তার বিরুদ্ধে লোকের মন বিষিয়ে তোলা, এ-সব কাজে তিনি কখনও কোন উৎসাহ দেননি। তিনি জানতেন যে ধর্মকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে লোকের ভাল করে। পাছে কোন কালে বৌদ্ধেরা অশোকের বুদ্ধানুরাগের সুযোগ গ্রহণ করেন তাই বোধ হয় তিনি তাঁর কোন অনুশাসনে বুদ্ধদেবের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি।

কিছুকাল পূর্বেও আমাদের দেশে দুই সম্প্রদায়ের লোক পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করেছে, পরস্পরকে হত্যা করেছে ধর্মের নামে। অথচ হিন্দু আর মুসলমানের জীবনের পথ সম্রাট বাবরের আমল থেকেই মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই মিলিত জীবন পথের নাম বাবর দিয়েছিলেন, "হিন্দুস্থানী পথ"। হিন্দু মুসলমানের দুই জীবনধারার এই মিলনকে রাজপুত্র দারা তুলনা করেছিলেন দুটি নদীর স্রোতের মিলনের সঙ্গে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক উস্কানিতে মিলনের এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের কথা ভুলে গেল সবাই। গত ষাট বছর ধরে কতবার কতভাবে যে আমাদের দেশে

সহিষ্ণুতার কথা শোনাতে হয়েছে তার শেষ নেই—এবং সে শোনাবার প্রয়োজন আজও শেষ হয়ে যায় নি।

সহিষ্ণুতা কাকে বলে? অন্যকে তার ইচ্ছামত চলতে দেওয়া, তোমার মতে চলতে বাধ্য না করার নামই হ'ল সহিষ্ণুতা, বিশেষ করে ধর্মের ব্যাপারে। সকলেরই যেন নির্বিবাদে নিজ নিজ ধর্ম আচরণের স্বাধীনতা থাকে। দুই উপায়ে তা সম্ভব। তোমার যদি ধর্ম সম্বন্ধে কোনই দরদ না থাকে, তবে তুমি সহজেই বলতে পার, "ধর্ম নিয়ে লোকে যা খুসি তা করুক, তা'তে আমার কী?" এই ভাবের নির্লিপ্ত লোকের সংখ্যাই আজকাল অধিক। আর যদি ধর্মে তুমি আনন্দ পাও এবং মনে কর যে অন্যেরও তার ধর্মে এমনি আনন্দ হওয়ার কথা, তা' হ'লে তুমি বলতে পার, "যে যেমন ভাবে চায় উপাসনা করুক না, সে-ই তো ভাল!" কিন্তু যদি তুমি পরমতসহিষ্ণু না হও, তবে তুমি জোর গলায় এই কথাই বলবে, "আমার ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম। অন্য ধর্মের লোক ভুল পথে চলেছে। আমার ধর্ম যদি সে গ্রহণ না করে তবে আমার কর্তব্য হ'ল জোর করে তাকে আমার ধর্মে আনা।"

অসহিষ্ণুতার চেয়ে সহিষ্ণুতা ভাল। আবার তার চেয়েও বড় কথা হ'ল অপরকে তার নিজ ধর্ম পালনে উৎসাহ দেওয়া;

এমন কি প্রয়োজন হ'লে সাহায্য করা। প্রাচীন ভারত ছিল এই শ্রেষ্ঠতম পথেরই পথিক। অন্য ধর্মমত সম্বন্ধে ভারতবর্ষ শুধু নির্লিপ্ত থেকেই ক্ষান্ত হয়নি, তার কিসে উন্নতি হয় সে চেষ্টাও সে করেছে। অশোকেরও মনের কথা ছিল তাই। একটি শিলালিপিতে তিনি যা লিখেগেছেন তাতেই তাঁর মহান সহিষ্ণুতার পরিচয় পাবে :—

"দেবপ্রিয়, প্রিয়দর্শী রাজা সকল ধর্ম সম্প্রদায়কেই সম্মানিত করেছেন। কী গৃহী, কী সন্ন্যাসী সকলকেই তিনি যোগ্য উপঢৌকন দিয়েছেন এবং নানা ভাবে তাঁদের পরিতুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। দেবপ্রিয়ের ইচ্ছা যে সকল ধর্মেরই উন্নতি ঘটুক ; এর তুলনায় কোন দান বা সম্মানই তাঁর কাছে বড় নয়। নানা উপায়ে সকল ধর্মের এই উন্নতি সম্ভবপর ; আর তার সার কথা হ'ল বাক্-সংযম। অনাবশ্যক ভাবে নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা বা অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা না করাই শ্রেয়। এ বিষয়ে সকলেরই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সকল সম্প্রদায়কেই তার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া কর্তব্য।

"এই নীতি যে মেনে চলে সে কেবল নিজের সম্প্রদায়েরই উন্নতি করে না, অন্য সম্প্রদায়েরও মঙ্গল সাধন করে। এর যে অন্যথা করে অন্য সম্প্রদায়কেই যে সে আঘাত করে তা

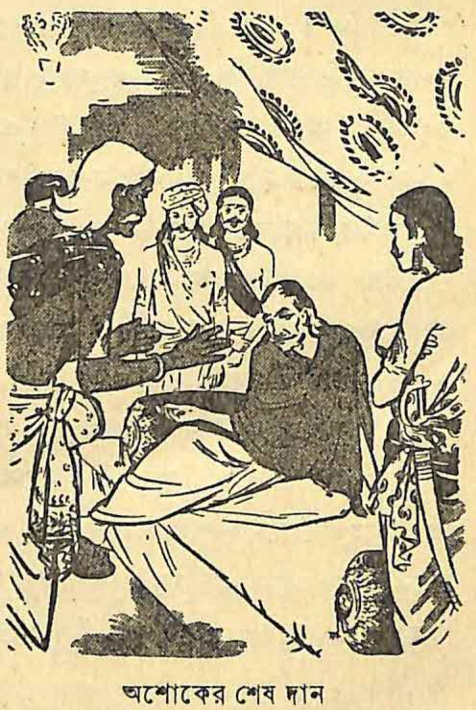
নয়, নিজের সম্প্রদায়েরও সে অনিষ্ট করে। যদি কেউ নিজের ধর্মকে বড় করার জন্য নিজের ধর্মের প্রশংসা বা অন্য ধর্মের নিন্দা করে, তবে সে নিজের ধর্মেরই ক্ষতি করে সব চেয়ে বেশী।

"সুতরাং সব চেয়ে বড় কথা হ'ল মৈত্রী। সকলকেই পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। দেবপ্রিয়ের প্রাণের কথা হল এই—সকল সম্প্রদায়ই জ্ঞানের চর্চা করুক, অপর ধর্মের ভাল কথাগুলি জানুক, আর নিজের ধর্মের ভাল কথাগুলি কাজে ফলিয়ে তুলুক।" প্রাণের কথা বলেই এত সহজে এত বড় সত্যি কথা তিনি বলতে পেরেছেন।

দীর্ঘ ছত্রিশ বছর ধরে নিজের বিশাল সাম্রাজ্যের এবং সারা পৃথিবীর উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন অশোক। দেহমনের বিন্দুমাত্র বিশ্রাম ছিল না তাঁর। এমন রাজ-জীবনের তুলনা নেই ইতিহাসে। তারপর একদিন অশোকের মনে হ'ল "আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে।" প্রধান অমাত্য রাধাগুপ্ত তাঁর পাশেই ছিলেন। রাজা তাঁকে বললেন যে বুদ্ধ সঙ্ঘে তিনি ছিয়ানব্বুই কোটি মুদ্রাদান করেছেন, আরও চার কোটি তাঁদের তিনি দিতে চান। কিন্তু রাজপুত্রের আর এক কপর্দক অর্থ দেবারও ইচ্ছা ছিল না। তাই তিনি বাধা দিতে লাগলেন নানা ভাবে।

অশোক তখন দানের অন্য পথ ধরলেন। রাজাদের প্রথা ছিল সোনার থালাবাটিতে খাওয়ার। প্রতিদিন খাওয়ার পরে তিনি সেই সব থালাবাটি সঙ্ঘে পাঠিয়ে দিতে সুরু করলেন। এ-কথা রাজপুত্রের কানে যেতে দেরি হ'ল না। সোনার থালার বদলে রাজার খাবার এল রূপোর থালায়। তা-ও তিনি দান করে দিলেন সঙ্ঘকে। তারপরে আর রূপোর থালাও নয়, এল লোহার থালা। রাজা তা-ও দান করলেন। শেষ পর্যন্ত রাজার খাদ্য আসতে সুরু করলো মাটির পাত্রে।

তখন হাতে একখণ্ড আমলকী নিয়ে রাজা ডেকে পাঠালেন তাঁর অমাত্যবর্গ এবং প্রজাদের। গভীর দুঃখের সঙ্গে তিনি তাঁদের



অশোকের শেষ দান

প্রশ্ন করলেন, "এ রাজ্যের এখন রাজা কে ?" সবাই সসম্ভ্রমে একবাক্যে বললো, তিনিই রাজা।

কিন্তু বাষ্পাকুল চোখে অশোক বললেন তাঁর অমাত্যদের, "আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তোমরা মিথ্যা বলো না। আমার সে রাজ-মহিমা আর নেই। আধখানা আমলকী ছাড়া আর কোন কিছু দান করার মত সম্বল আজ আর আমার নেই।"

এই শক্তিশালী সম্রাট কী রকম সহজ এবং শুচি-শুদ্ধ জীবন যাপন করেছেন সে-কথা আমরা ভাবতেও পারি না। তাঁর সমস্ত তিনি দান করেছিলেন লোকহিতের জন্য। ভাবতে পার এমন ত্যাগী সম্রাটের কথা—জীবনের শেষ সময়ে যাঁর আধখানা আমলকী ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না ?

ভক্তিভরে ভগবানের কথা চিন্তা করা বড় কথা। তেমনি বড় কথা হ'ল মানুষের মঙ্গল চিন্তা করা। ভগবানের সেবা আর মানুষের সেবা দুই-ই ধর্মের অঙ্গ। একটি হ'ল ব্যক্তিগত দিক—সৃষ্টিকর্তার পায়ে তোমার আত্মাকে অঞ্জলি দেওয়া। আর একটি হল সামাজিক দিক, তোমার প্রতিবেশীর মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করা। শ্রেষ্ঠ মানুষ যাঁরা তাঁরা ধর্মের এই দুই অঙ্গের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাঁরা মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই ভগবানের অর্চনা করেছেন। অশোকও তাই

করেছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সমাজের সেবা করেছেন।

মৃত্যু শয্যায় অশোক কিন্তু তাঁর শেষ প্রতিজ্ঞার সম্মান রেখেছিলেন—বৌদ্ধ সঙ্ঘে তাঁর সেই চার কোটি দানের প্রতিজ্ঞা। অত অর্থ দান করার মত সঙ্গতি তাঁর ছিল না। তবু এক অভিনব উপায়ে তিনি আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন।

সম্রাট একজন অনুচরকে ডেকে বললেন, "আমার এই আধখানা আমলকী নিয়ে তুমি সঙ্ঘে গিয়ে বল, আপনারা দেখুন জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র সম্রাটের ঐশ্বর্যের কী অবশিষ্ট আছে। এই তাঁর শেষ দান। এমন ভাবে এই আমলকী আপনারা ভাগ করে খাবেন যেন সকলেই এর অংশ পায়।"

সঙ্ঘের সর্বজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু শুনলেন এই করুণ কাহিনী। সেই আমলকী খণ্ড হাতে নিয়ে তিনি বললেন, "এমন কি কেউ আছে যার মন আজ বেদনায় অভিভূত হবে না?" বেদনায় বিহ্বল হল সবাই। সম্রাটের দানের মর্যাদা দিয়ে, সঙ্ঘের সকল ভিক্ষু মিলে অন্তরের সমারোহে সেই আধখানি আমলকী গ্রহণ করলেন। অপূর্ব দান; অপূর্ব গ্রহণ!

তখন পরম শান্তিতে অশোক দেহত্যাগ করলেন। কিন্তু আজও তিনি বেঁচে আছেন। শুধু আজ নয়, তিনি চিরকাল

বেঁচে থাকবেন। তাঁর সাধনা অমর, তাই তিনিও অমর। তিনি বেঁচে আছেন আজ তাঁদের মধ্যে যাঁরা শান্তি ভালবাসেন, যাঁরা চেষ্টা করেন শান্তি স্থাপনের। পরে যখন শান্তির ব্রত পালনে আসবে তোমাদের পালা,



তখনও তিনি থাকবেন, থাকবেন তোমাদের তরুণ হৃদয়ে আশাও বিশ্বাসের আলো জ্বালিয়ে রাখতে।